প্রথম প্রকাশ
মহালয়া, ১৩৬৫

প্রকাশক
রঞ্জনকুমার দাস
রঞ্জন পাবলিশিং হাউস
কলিকাতা-৩৭

মুদ্রক
রঞ্জনকুমার দাস
শনিরঞ্জন প্রেস
কলিকাতা-৩৭

প্রচ্ছদ-চিত্র
বিভূতি সেনগুপ্ত

ব্লক ও মুদ্রণ
ভারত ফটোটাইপ স্টুডিও
কলিকাতা-১২

স্ব গ ত সং লা প

আমার তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'কলকল্লোল' প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে, দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'শূন্য প্রান্তরের গান' ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে। ১৯৫৬-র সেপ্টেম্বর-অক্টোবর থেকে ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর পর্যন্ত, এই পনেরো বছরের মধ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় আমার যে সমস্ত কবিতা প্রকাশিত হয়েছে, এই কাব্যগ্রন্থ সেই কবিতাসমূহ থেকে নির্বাচিত আটাত্তরটি কবিতার সঙ্কলন। নিজের লেখার কৌলীন্য নিজে বিচার করে গ্রহণ বর্জন একটা দুরূহ কাজ। কারণ, মমতা নিরপেক্ষ বিচারের পথ রোধ করে দাঁড়ায়। একমাত্র নিজের ভালো-লাগা, না-লাগার নিরিখেই এই গ্রহণ বর্জন কিছু পরিমাণে সম্ভব। আমিও তা'ই করেছি।

এ কখানি গ্রন্থে দীর্ঘ পনেরো বছরে প্রকাশিত কবিতার স্থান দিতে হয়েছে। সেইজন্য কবি-মানস এবং কবিতার ভাব ভাষা ও ভঙ্গির বিবর্তন-ধারাটি সহজলক্ষ্য করবার উদ্দেশ্যে প্রত্যেকটি কবিতার নীচে তার প্রকাশ-কাল উল্লেখ করে গেছি। মাত্র কয়েকটি কবিতার ক্ষেত্রে রচনাকাল ও প্রকাশকালের মধ্যে কয়েক বছরের ব্যবধান আছে। তা' ছাড়া আর সমস্ত কবিতাই যে বছরে রচিত, সেই বছরেই প্রকাশিত।

কালে কালে রসরুচির রূপান্তর ঘটে, ফলে কাব্য-বিচারের মানদণ্ডও পরিবর্তিত হয়। বিশেষতঃ আধুনিক বাংলা কবিতার বৈচিত্র্য ও বিস্তার বিস্ময়করভাবে অগ্রগতির অভিমুখী। সে ক্ষেত্রে আমার কবিতা সহৃদয় কাব্যরসিক সমাজ কী ভাবে গ্রহণ করবেন জানিনা। শ্রদ্ধা এবং সঙ্কোচবোধের সঙ্গে সে ভার আমি তাঁদের উপরেই অর্পণ করলাম।

আমার অখ্যাত কবি-জীবনের বিভিন্ন পর্বে যাঁরা অকপট স্নেহ ও প্রীতিভরে আমাকে উৎসাহ দান করেছেন, তাঁদের সকলের উদ্দেশে আমার কৃতজ্ঞচিত্তের প্রীতি ও প্রণতি জানাই।

কিছুই প্রত্যাশা না করে যে এই গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুতিতে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছে এবং পূর্ণাঙ্গ মুদ্রিত মূর্তি দেখবার জন্য সকলের চেয়ে বেশী আগ্রহ প্রকাশ করেছে, সে হচ্ছে আমার পুত্র শ্রীমান জয়ন্ত চক্রবর্তী। সাহিত্যানুরাগের উত্তরাধিকার শ্রীমানের জীবনে সার্থক হয়ে উঠুক,—এ-ই আমার আন্তরিক কামনা।

শিবদাস চক্রবর্তী

সূচী

—

সহরে শরৎ এলো

সহরে শরৎ এলো। চোখে মুখে তার
নব জাতকের মতো কান্না-ভরা হাসি।
বর্ষার জঠর টুটে এলো সে বেরিয়ে —
বুক-ভরা বাসনার জীবন্ত বিগ্রহ।
দুর্যোগকে চিনেছে সে মাতৃগর্ভে শুয়ে,
তাই তার কণ্ঠস্বরে ক্রন্দনের রেশ।
সে-কান্নার মাঝে আছে মিশে
নিখিল বেদনাহত মানবের অস্ফুট ক্রন্দন।
দেখেছে সে দুর্যোগের অনাবৃত রূপ,
অন্তরে শুনেছে তবু সুযোগের আগমনী বাণী, -
অদন্তক মুখে তাই ঝরে রাঙা হাসি।

শিউলী-ছড়ানো-পথে আসেনি সে পল্লীর দুলাল,
এসেছে কঙ্কর-ভরা সহরের রুক্ষ রাজপথে।
মমতার মাটি তাকে দেয়নি আশ্রয়,
ক্ষমতার ইট তাকে কোলে নিলো তুলে।
তাই তার চোখে লেখা কঠিন শপথ—
ঘুচাবে সে সর্ব গ্লানি এই ধরিত্রীর ;
ভরবে সে রিক্ত ক্ষেত হৈমন্তিক সোনার ফসলে,
করবে সে প্রতি ঘরে ঘরে
নবান্নের আয়োজন,
জাগাবে সে বাসি মুখে হাসির হিল্লোল।
তারপর সেই হাসি ভাগ করে করবে সে ভোগ
সকলের সঙ্গে বসে প্রাণ-খোলা মনে—
শীতের হিমেল রাতে, বসন্তের বিহ্বল সন্ধ্যায়।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৩

রোজনামচা

রাত্রি দশটা বাজে।
মহানগরীর শ্রান্ত দু'চোখে তন্দ্রার ঘোর নামে,
লোক চলাচল ক্ষীণ হয়ে আসে পথে।
সারা পথ থেকে যাত্রী কুড়িয়ে
শেষ বাসখানি ঝিমিয়ে ঝিমিয়ে চলে ;
সেই ভোর থেকে ছুটে ছুটে তার অবশ হয়েছে পা।
কর্ম সাঙ্গ করে
আমি ফিরে আসি আর ফেরে ঐ ফিরিওলা, মুদী, মুটে।
কারো হাতে আছে ওষুধের শিশি, আর কারো হাতে ঝাঁকা।
হয়তো বাড়িতে একা কারো প্রিয়া পথ পানে আছে চেয়ে,
কারো ছেলেমেয়ে হয়তো বাড়িতে রোগশয্যায় শুয়ে।
নৈশ অধ্যাপনা শেষ করে ফিরছে অধ্যাপক,
এক হাতে আছে ব্যাগ-ভরা বই, আর হাতে আছে ছাতা।
বাড়ি ফিরে গিয়ে গৃহিণীর মুখে হয়তো শুনতে পাবে
ছেলে মেয়ে আজ বই না পড়েই ঘুমিয়ে পড়েছে আগে।
নিরালা বাসের লেডী সিটে বসে ঝিমায় দুইটি মেয়ে—
লাবণ্য-মাখা সারা চোখে মুখে শ্রান্তির ছাপ আঁকা,
অবসাদ-ভরা অবশ অঙ্গ নুয়ে নুয়ে পড়ে প্রায়
সামনের ঐ ফিরিওয়ালার গায়ে।

তন্দ্রালু চোখে চেয়ে দেখি সব আর মনে হয় যেন
আমরা শুধুই ফিরতি বাসের চলতি যাত্রী নই,
মানুষ হয়েছি একই সংসারে ভাই-ভগিনীর মতো,
জীবিকা-ক্ষেত্রে সবার জীবন একই সূত্রে গাঁথা

আসে না বিকাল, আসে না সন্ধ্যা আমাদের এ জীবনে,
আসে ফিরে ফিরে ভোর ও গভীর রাত।
আছে ত্বরা, আছে ত্রস্ততা, নেই আরামের অবসর,
আঠারো ঘণ্টা কাজের চাকায় বাঁধা।
জীবিকার চাপে জীবন পঙ্গু, সংসারে হাহাকার,
দেহ মন বেচে আমরা চালাই জীবনের কারবার।
বেঁচে আছি — এই সান্ত্বনা নিয়ে লাঞ্ছনা সয়ে চলি,
তারপর একদিন
জীবনের ঋণ পরিশোধ করে মৃত্যুর কাঞ্চনে
খালি করে দিয়ে পৃথিবীর বুক আমরা বিদায় নিই।

শারদীয়া জয়শ্রী, ১৩৬৩

দুই নারী

আমাকে দু'জন নারী এ জীবনে দিয়েছিল ডাক,
দুয়েরি নামের শেষে মিল ছিল—মনীষা, বিপাশা।
কে ছিল দু'য়ের মাঝে সেরা,—সে বিচার আজ থাক,
এখন আমার কাছে দু'জনেই সমান দুরাশা।

মনীষা দিয়েছে ডাক মরণ-বাসরে, শুনিয়েছে
কানে কানে ঘুম-আনা গান; দু'টি কালো চোখে তার
সহসা কথার ফাঁকে স্বপ্নাবেশ ঘনায়ে উঠেছে
সংসার-সমুদ্রতীরে চিরস্থির নীড় রচনার।

বিপাশার বুকে ছিল আনন্দের দুরন্ত পিপাসা,
চোখে নীল আকাশের অন্তহীন অবাধ বিস্তার,
ভাসিয়ে হৃদয়-তরী জীবনের স্রোতে সর্বনাশা
চেয়েছে সে ভেসে-চলা নিরুদ্দেশ পথে অনিবার।

জানি না দুয়ের মাঝে কার 'পরে ছিল অনুরাগ,
বিপাশা আমার মনে, আজ দেখি, রেখে গেছে দাগ।

শনিবারের চিঠি, ভাদ্র ১৩৬৩

একটি রাত্রি

রাত্রি যে অনেক হলো, আজ তবে এ পর্যন্ত থাক্।
জমানো কথার পুঁজি একদিনে নিঃশেষে ফুরাক্
নিশ্চয় চাও না তুমি? তবে কেন এত চঞ্চলতা?
বলো দেখি সত্যি করে কী তোমার অন্তরের কথা।
জানি আমি—আমাকে সমস্ত রাত্রি জাগিয়ে রাখার
কৌশল তোমার জানা। তাই যদি বাসনা তোমার,
সে কথা আমার কাছে মিছে আর কোরোনা গোপন,
ঘুমিয়ে কী কাজ আজ, হোক্ সারা নিশি জাগরণ।
বিছাক্ এ-রাত্রি তার আঁধারের রহস্যের জাল,
ঘুচে যাক্ থাকে যদি বিন্দুমাত্র আলোর আড়াল।

প্রথম মিলন-রাত্রি এলো দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর;
বুক কাঁপে দুরুদুরু, সারা তনু তাপে জরজর,
কাটুক প্রতিটি ক্ষণ সবেদন ব্যাকুল আশায়
আকাঙ্ক্ষিত লগ্ন যেন কাছে এসে বিফলে না যায়।
কে বেশী রহস্যময়ী রজনী ও রমণীর মাঝে,
সে-তত্ত্বের সদুত্তর এতদিন জানা ছিল না যে;
আজ সে সুযোগ যদি এসে থাকে আমার জীবনে,
ফিরাবো না তাকে আর দূর থেকে বিরূপ ভাষণে।
এ রাত্রি সহজে যদি না পোহায়, নেই কোন ক্ষতি,
আমার সমস্ত সাধে যদি থাকে তোমার সম্মতি।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা ১৩৬৩

আশ্চর্য তোমার মুখ

আশ্চর্য তোমার মুখ। দিনে রাতে দেখি কতবার
চেয়ে চেয়ে নানা ছলে, তবু সাধ মেটে না দেখার।
কারণে ও অকারণে বারংবার ছুটে যাই কাছে,—
আমার এ দুর্বলতা কোনক্রমে ধরা পড়ে পাছে,
কপট কলহ তাই গড়ে তুলি কটু কথা বলে।
ক্ষোভ আর অভিমানে মনে মনে তুমি ওঠ জ্বলে,
সে-জ্বালা ছড়ায় ঠোঁটে রুদ্ধবাক্‌ কান্নার কাঁপনে,
বিদ্যুৎ বিকীর্ণ করে বাষ্পগর্ভ দু'নয়ন-কোণে।

তুমি কাঁদো মনে মনে, আমি বুঝে মনে মনে হাসি।
তোমার হাসি ও কান্না আমি যে সমান ভালবাসি—
সে-কথা বোঝ না তুমি। যাত্রা করে দু'পথে দু'জন
একই তীর্থধামে এসে সাঙ্গ করি মানস-ভ্রমণ।
রাগ আর অনুরাগে হয়ে যায় মিতালী গোপনে,
জানি নে তুমি কী ভাবো, আমি নিজে ধন্য মানি মনে।

শনিবারের চিঠি, বৈশাখ ১৩৬৪

জৈবিক

ঝড়ে-জলে ধ্বসে-পড়া জরাজীর্ণ সেকেলে বাড়ির
আমরা ভিতর থেকে ঘুণে-খাওয়া অসার মানুষ,
এ পৃথিবী আমাদের—আহতের আশ্রয়-শিবির,
পরাস্ত জীবন-যুদ্ধে, জ্বরে আর বিকারে বেহুঁস।

চারিদিকে কোলাহল—কারা যেন কাঁদে, কারা হাসে,
সে হাসি-কান্নার শব্দে মাঝে মাঝে ভাঙে তন্দ্রা-ঘোর ;
সহসা দুঃস্বপ্নে যেন চেতনা পীড়িত হয় ত্রাসে,
তারপর মুহূর্তেই আবার সে নিদ্রায় বিভোর।

আমাদের পথে নেই সুদূরের অদৃশ্য আহ্বান,
আমাদের পথ চলা—একই পথে নিত্য যাতায়াত ;
সে পথে পড়ে না চোখে শ্যাম শোভা, রমণীয় স্থান,
নগ্ন পায়ে লাগে শুধু কঙ্করের কঠিন আঘাত।

আমাদের মন মৃত, আছে শুধু জৈবিক কামনা,
তাই নিয়ে চলে নিত্য জীবনের যত লেন-দেন ;
যেখানে মাংসের গন্ধ সেখানেই করি আনাগোনা,
আকণ্ঠ করেছি পান সংসারের মদিরা সফেন।

আমরা তলিয়ে গেছি সমুদ্রের চোরা পাকে পড়ে,
দু'চোখ জুড়িয়ে নেবো কূলে উঠে আকাশের নীলে,
সে আশা নির্মূল, ফের কল্পনার পক্ষীরাজে চড়ে
যোগ দেব মানুষের আনন্দ ও বেদনা-মিছিলে।

নিঃশেষিত আমাদের আলো আর উত্তাপের পুঁজি,
নিয়ত সংঘাতে গেছি নক্ষত্রপুঞ্জের মতো ক্ষয়ে,
নতুন মানব-গ্রহ আকাশের কোণে তাই বুঝি
চুপি চুপি দেখা দিল নতুন প্রাণের বার্তা বয়ে।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৪

পদাতিক

সে গেছে অনেক দূরে পৃথিবীর সীমান্ত পেরিয়ে
দুরাশার বোঝা পিঠে অবসন্ন শ্রান্ত পদাতিক,
চলেছে দূরের পথে জানি না সে কী পাথেয় নিয়ে
ভরা তরী-ডুবি শেষে দিশাহারা বিপন্ন নাবিক।

সহজে পেয়েছে যা' তা বারবার দিয়েছে সে ফেলে,
সহস্র দুর্যোগ মাঝে চিরদিন দেখেছি নির্ভয় ;
একা পথ হেঁটে গেছে অন্ধকারে বজ্রবহ্নি জ্বেলে,
পথেই ছড়িয়ে গেছে জীবনের যা' কিছু সঞ্চয়।

এখন সে বহুদূরে —আর কেন মিছে ডাকা তাকে,
এই সৌরজগতের নাম-হারা অন্য কোনো গ্রহে,
হয় তো দেবে না সাড়া কিছুতেই তোমাদের ডাকে,
যে-পাখি পেয়েছে ছাড়া সে কি ফেরে পিঞ্জরের মোহে ?

তার নামে বর্ষে বর্ষে দু'ফোঁটা আতপ্ত অশ্রুজল
তোমরা না ঢালো যদি যাত্রা তার হবে না নিষ্ফল।

শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৬৪

২

সন্ধানে

অথচ তাকেই আমি খুঁজে ফিরি এ জীবন ভরে
পথে জনতার ভীড়ে, নীলাকাশে তারার মেলায়,
শরতে বসন্তে শীতে, শ্রাবণের দুর্যোগ-সন্ধ্যায়,
কাটাই অলস বেলা তার ডাক-নাম জপ করে।
আমার সুখের দিন বসে থাকে তারি' অপেক্ষায়
তার মুখ চেয়ে, তার স্পর্শ পেয়ে ধন্য হবে বলে ;
সে আসে না, মনে তবু নিত্য তার আনাগোনা চলে,
আমার দুঃখের রাত্রি তারি' ধ্যানে অলক্ষ্যে পোহায়।

একান্ত সান্নিধ্যে এসে তবু শেষে দিল না সে ধরা,
আভাসে আশ্বাস দিল, অসঙ্কোচে দিল না আশ্রয় ;
তার সেই আসা-যাওয়া সপ্তর্ষির তির্যক অক্ষরে
মনের আকাশে লেখা রয়ে গেল চির প্রশ্নে ভরা।
রাখিনি ঠিকানা তার,—মনে কোনো ছিল না সংশয়,
জান তো কে নিজে নিজে কাছে এসে দূরে যাবে সরে !

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৫

এ দিন যাবেই যাবে

এ দিন যাবেই যাবে
বিষণ্ণ প্রহর এর যত দীর্ঘ হোক।
শ্রাবণের মেঘ, তা' সে যত কালো হোক্,
কেটে গিয়ে একদিন এ আকাশে দেখা দেবে ফের
আশ্বিনের প্রসন্ন আলোক।
কাশের শোভায় আর শেফালীর বাসে
হৃদয় উত্তাল হবে প্রসন্ন উল্লাসে।
অন্ধকার চির সত্য নয়,
প্রতিটি প্রভাত তাই নিত্য আনে আলোকের জয়।
সে জয়ে পাখির কণ্ঠে বেজে ওঠে গান,
সমুদ্র তরঙ্গভঙ্গে মহা কলতান।
সে জয় আঁধার রাতে তারায় তারায়
কম্পমান হয়ে ওঠে স্তিমিত শিখায়।
মেঘে মেঘে বিচ্ছুরিত বিদ্যুতের মতো
সেই জয় আলো করে কালো মুখ যত।
একদা হবেই হবে দুর্যোগের চির অবসান
যদি থাকে মনে মনে সুযোগের সাগ্রহ আহ্বান।

শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৬৫

অ-পরাস্ত

ক্ষমতার খড়্গ হাতে যার, দেখেছি সে বারংবার
হেনেছে আঘাত যত অস্ত্রহীন অক্ষমের 'পরে।
একের উল্লাস তাই অমাণিত অগণ্যের ঘরে
তুলেছে ক্রন্দন রোল—ইতিহাস সাক্ষী আছে তার।

অন্যায় ঘটেছে যত এ জগতে তার চেয়ে বেশী
ঘটেছে ন্যায়ের নামে বিচারের মিছে প্রহসন,
শাস্ত্র নয়, শস্ত্রমুখে সহসা হয়েছে নির্ধারণ
ন্যায়-অন্যায়ের জাতি দু'মুখো দ্বন্দ্বের শেষাশেষি।

তবু দেখি যুগে যুগে দুর্দমের যত অপরাধ—
শেষে তার বজ্রমুষ্টি একেবারে করেছে শিথিল,
এনেছে নতুন দিন দুনিয়ায় নতুন সংবাদ।
বাঁচার আগ্রহ-ভরা বেদনায় জাগ্রত নিখিল
কণ্ঠে নিয়ে দাম্ভিকের অন্যায়ের দৃঢ় প্রতিবাদ,
অ-পরাস্ত তাই আজো মানুষের অশান্ত মিছিল।

কথাসাহিত্য, শারদীয় ১৩৬৩

তোমাকে দিলাম

তোমাকে দিলাম।
জানি না তোমার চোখে কোনোদিন পড়ে কি না পড়ে,
তবুও অতীত স্মৃতি নীরবে স্মরণ করে আজ
আমার প্রথম বই তোমাকে দিলাম।
যদি কোনোদিন হাতে পড়ে
পড়ো বা না পড়ো,
একবার নেড়ে চেড়ে স্পর্শ দিয়ে ধন্য কোরো একে।
রেখে দিয়ো একখণ্ড নানা গ্রন্থসঞ্চয়ের স্তূপে।
জানবে না কেউ এর রচনার গুপ্ত ইতিহাস,
পাঠকের কাছে হবো আমি গ্রন্থকার।
ভালোয়-মন্দয় মিশে কিছুকাল ধরে
হয়তো স্মরণে রবো সহৃদয় কোনো পাঠকের;
তারপর ডুবে যাবো বিস্মৃতির অতল সাগরে
অগণিত যশঃপ্রার্থী মন্দকবি সম।
সে যা হোক্ এহ বাহ্য,
আমার আসল কথা এই—
তোমারই অলক্ষ্য হাত এই গ্রন্থ করেছে রচনা,
আমি শুধু অনুগত লেখনী তোমার।
বাড়িয়ে বলিনি কিছু, এ আমার সত্যের স্বীকৃতি।

আমার এ মন ছিল নিস্তরঙ্গ গ্রাম্য নদী সম,
আপন সীমার মাঝে নিয়ে নিজ নির্বাক জগৎ।
তুমি এলে,—এলো সঙ্গে আলোক, পুলক,
জাগলো সে নদী বুকে সহস্র কল্লোল।
এ বইয়ের পাতায় পাতায়
সে সহস্র কল্লোলের অগণিত ধ্বনি
অলক্ষ্যে পড়েছে ধরা অক্ষরের অমর বাঁধনে।
তাই আত্মপ্রকাশের এই শুভক্ষণে
সমস্ত অতীত স্মৃতি নীরবে স্মরণ করে আজ
আমার প্রথম বই তোমাকে দিলাম।

শনিবারের চিঠি, আশ্বিন ১৩৬৫

সোনালী সকাল

অনেক বৃষ্টির পরে উঠেছে রোদ্দুর,—
অনেক কান্নার শেষে ওষ্ঠপুটে প্রাণ-খোলা হাসি।
যে আকাশ এতদিন ঢাকা ছিল কালো মেঘে মেঘে,
আজকে সে কেঁপে ওঠে আলোর আবেগে।
নীড় ছেড়ে দলে দলে ভীড় করে শালিক, চড়ুই,
উচ্ছ্বসিত কলভাষে আশ্বিনের সূর্য সংবর্ধনা।
রূপালী ধানের শীষ ছুঁয়ে চলে উদাসী বাতাস,
দূরে নীল নদী তীরে হাসে শুভ্র কাশ।
জাফরানী রাঙা রোদে মেলে দিয়ে সবুজ আঁচল
মুখরা প্রকৃতি আজ মূক হয়ে কাকে যেন খোঁজে।
আসন্ন পূজার দিন,—চারিদিকে শিশুরা চঞ্চল,
শিউলি গাছের নীচে ফুল নিয়ে করে কাড়াকাড়ি।
এমন খুশীতে ভরা শরতের সোনালী সকাল,
মুগ্ধ চোখে চেয়ে আছি একা বসে জানালার ধারে।

শারদীয়া জয়শ্রী, ১৩৬৫

মহেঞ্জোদড়ো

সময়ের সিঁড়িগুলি যত হই পার
মনে হয় হয়তো এবার
স্তব্ধ হলো জীবনের জীর্ণ ইতিহাস।
একদিন এ পৃথিবী, উদার আকাশ
পূর্ণ করেছিল প্রাণ কাহিনী ও গানে।
মনে হয় আজ কোনোখানে
তার কোনো চিহ্ন নেই, ধীরে ধীরে লুপ্তির কবলে
গেছে তারা চলে।

কে যেন তখন বলে — মূর্তি ধরে সামনে যে নাই
মাটির অতল তলে পেয়েছে সে ঠাঁই,
আবিষ্কারের নেশা পেয়ে বসে সবার অজ্ঞাতে।
একা একা স্তব্ধ রাতে
মনের মহেঞ্জোদড়ো চলি খুঁড়ে খুঁড়ে।
চেয়ে দেখি — আছে পড়ে মাটির গহ্বর জুড়ে
ভুলে-যাওয়া কাহিনীর অজস্র ফসিল।
ভাঙা-ভাঙা স্বপ্ন-সৌধ, সরল কুটিল,
বহু রাজপথ, গলি অতীতের স্মৃতি বুকে নিয়ে
ঘুমন্ত নগরী ঘিরে চলেছে এগিয়ে।
অলিখিত ইতিহাস নিয়ে তার মূক উপাদান
ক্লান্ত লেখনীকে ফের জানায় আহ্বান।
খুলে যায় জীবনের নতুন অধ্যায়,
ভরে ওঠে মূক মুখ অজস্র কথায়।

শারদীয়া যুগান্তর, ১৩৬৬

শীতের বেলা

শীতের পড়ন্ত রোদে ভরে গেছে ঘরের উঠান,
বেলা শেষ হয়ে আসে, অচিরেই স্তব্ধ হবে গান
অরণ্য প্রদেশে যত পথিক পাখির। দিনান্তের
বিষণ্ণ সঙ্কেত বাজে গ্রামান্তের ক্লান্ত রাখালের
বাঁশের বাঁশীর সুরে। দ্রুত পায়ে ফিরে আসে ঘরে
হাটে যারা গিয়েছিল পণ্য ক্রয় বিক্রয়ের তরে।
বেলা শেষ হয়ে আসে, মৃদুমন্দ হিমেল হাওয়ায়
বনস্পতির অঙ্গে অতর্কিতে কাঁপন জাগায়।
এখুনি মিলিয়ে যাবে এই রোদ খুশিতে চঞ্চল,
চির নৈঃশব্দের মাঝে লীন হবে সব কোলাহল
নিঃশেষিত মুমূর্ষু দিনের। জীবন-সংগ্রামে ক্ষত
অচিরে অদৃশ্য হবে ওই সূর্য এবারের মতো
মুহূর্তে বিকীর্ণ করে নিরুত্তাপ যৌবনের দ্যুতি
শেষ বার ; পশ্চিম আকাশে তারি ত্বরিত প্রস্তুতি।

শনিবারের চিঠি, মাঘ ১৩৬৬

সে আর এ

সে এক জগৎ ছিল,—কল্পনার জগৎ সৌখীন,
মাটির পৃথিবী থেকে কিছু উর্ধ্বে অবস্থান তার ;
ছিলনাকো সে জগতে সকলের প্রবেশাধিকার।
সেখানে আমার এক জীবনের অধ্যায় রঙীন
কেটেছিল গান গেয়ে লেশমাত্র উদ্বেগবিহীন।
ছিল ভার নিজে হেসে প্রতি মুখে হাসি ফোটাবার।
ঘুচিয়ে সমস্ত গ্লানি প্রত্যহের জীবনযাত্রার
ভরেছি আনন্দে তাই অনেকের নিরানন্দ দিন।

এ এক জগৎ মাঝে বন্দী হয়ে করি আজ বাস ;
চারিদিক ঘিরে আছে বাস্তবের লৌহ-বেড়াজাল।
প্রত্যেকে প্রাণের দায়ে কাঁধে নিয়ে কাজের জোয়াল
এখানে বেড়ায় ঘুরে। মুহূর্তের নেই অবকাশ—
করি কারও নিরাশায় কিছু সমবেদনা প্রকাশ ;
স্বার্থের তরঙ্গাঘাতে জীবনের সমুদ্র উত্তাল।

শনিবারের চিঠি, পূজা সংখ্যা ১৩৬৬

মূল্যায়ন

এতদিন মনে হতো তুমি শুধু শয্যার সঙ্গিনী
পৌরুষ-কাঞ্চনে-কেনা পণ্য এক মহামূল্যবান ;
কর্ম মূর্তিমতী হয়ে সংসারে তোমার অধিষ্ঠান,
আমার সুখের জন্য হাসি-মুখে সর্বস্বত্যাগিনী।

রমণী রহস্যময়ী—একথা করিনি অস্বীকার,
মনে হতো সে-রহস্য নয় তবু অপার অগাধ,
যতই হোক না কেন সুমধুর অমৃতের স্বাদ,
ক্ষুধা ক্ষান্ত হলে আর থাকে না সে চাহিদা সুধার।

নিয়ত নিকটে রাখি, ছিল না এমন কোন মোহ,
বারংবার-পড়া গ্রন্থ, ব্যবহারে মলিন প্রচ্ছদ ;
কাহিনী নতুন নয়,—জাগাবে যা' কল্পনা দুর্মদ,
অজস্র কাজের মাঝে স্মরণের আকুল আগ্রহ।

বন্ধুর বাড়িতে ছিল সেদিন বিয়ের নিমন্ত্রণ,
দু'জনে সেখানে গেছি যথাকালে মধ্যাহ্ন-ভোজনে ;
গিয়ে দেখি—ভরা ঘর আমন্ত্রিত আত্মীয়স্বজনে,
অদূরে পাশের ঘরে হয়েছে গানের আয়োজন।

সকলের পীড়াপীড়ি অনুরোধ না পেরে এড়াতে
সুরযন্ত্র টেনে নিয়ে তুমি গান করে দিলে শুরু ;

আমি তো লজ্জায় মরি, ভয়ে বুক কাঁপে দুরুদুরু,
জানি না কী লোক-নিন্দা লেখা আছে আজকে বরাতে

ভাবতে অবাক লাগে—যার মুখে এতদিন ধরে
শুধুই কাজের কথা শুনে শুনে পচে গেছে কান,
সে-কণ্ঠে এমন সুর, প্রাণে তার আছে এত গান
জানতে দাও নি আগে আমাকে কখনো ঘুণাক্ষরে।

আজকে আমার মনে তোমার নবীন মূল্যায়ন—
অতুল ঐশ্বর্যময়ী অফুরন্ত খনিজ সম্পদে ;
তোমাকে নতুন করে পেয়ে আমি ধন্য, হে শুভদে,
যে-তুমি আংশিক ছিলে, পূর্ণ আজ নিয়ে দেহ মন।

সমাবেশ, গীত সংকলন, ১৩৫৬

পদাতিক

পদে পদে শত বাধা, তবু হেঁটে চলেছি সমানে
পুরানো এ পৃথিবীর আমি এক ক্লান্ত পদাতিক।
এ পথের শেষ আর কতদূরে জানি না সঠিক,
চলেছি অক্লান্ত পায়ে,— জানি নাকো কিসের সন্ধানে।
নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়েও বিজয়াভিযানে
অকূল সমুদ্রবুকে অন্ধকারে ভুল হলে দিক,
হয়তো জাহাজ কূলে প্রাণভয়ে ভিড়ায় নাবিক ;
আমার চলায় ছেদ পড়েনিকো কোনো পিছুটানে।

রাত্রির দুরাশা সাথে মিশে গিয়ে দিনের নিরাশা
অলক্ষ্যে করেছে সৃষ্টি দৃষ্টি ঘিরে স্বপ্ন-মায়াজাল ;
সাধ্য নেই ভেদ করে দৃষ্টি নাশা সে ঘোর কুয়াশা
দেখে নেবো বাকী পথে আরো কত রয়েছে জঞ্জাল।
পথকে বেসেছি ভালো —এ বিশ্বাসে, সেই ভালোবাসা
নিয়ে যাবে লক্ষ্যস্থলে ঘুচিয়ে সে মায়ার আড়াল।

সপ্তর্ষি (কার্তিক-পৌষ) ১৩৮৬

জিজ্ঞাসা

বলি-বলি করে হয়নি যে কথা বলা
 মুখ ফুটে আজো কখনো তোমার কাছে,
প্রাণপণে তাকে মনে মনে চেপে আছি,
 শোনা হলে শেষে রাগ করো তুমি পাছে
 আশা ঘিরে তাই আশঙ্কা জেগে রয়—
 সে-কথা কাউকে বুঝিয়ে বলার নয়।

তোমার মনের অবচেতনার মাঝে
 জানি না এমনি সঞ্চিত আছে কিনা
কোনো কথা, - শুধু আমাকে যা' বলা চলে,
 স্বভাবত তুমি এত উত্তাপহীনা।
 মাঝে মাঝে তাই রীতিমতো পাই ভয়—
 হয়তো আমার অনুমান ঠিক নয়।

অথচ দু'জনে কত কাছাকাছি বসে
 কত দিন কত বিষয়ে হয়েছে কথা;
কখনো তোমার কাঁপেনি কণ্ঠস্বর,
 ভুলেও দু'চোখে জাগেনিকো চপলতা।
 উদ্যোগী হয়ে কেন তুমি উদাসীন—
 ভেবে ভেবে রাত কেটেছে নিদ্রাহীন।

জবাব পাইনি তবু ছুটে গেছি কাছে,
 যেতে দেরী হলে গম্ভীর মুখ করে

বসতে বলেছ অন্য কাউকে দিয়ে,
        কাজ অজুহাতে রয়েছ পাশের ঘরে।
        চায়ের পেয়ালা নিঃশেষপ্রায় হলে
        উঠেছি সেদিন আবার আসবো বলে।

দিনে দিনে তুমি উঠেছ হেঁয়ালী হয়ে,
        আর আমি শুধু মনে মনে বিব্রত ;
তোমার হয়তো হয়নি কোনোই ক্ষতি,
        দ্বন্দ্বে আমারি হৃদয় হয়েছে ক্ষত।
        প্রশ্রয় পেয়ে আশ্রয় পাছে চাই,
        প্রশ্ন জাগিয়ে উত্তর দাও নাই।

কত কাল ধরে ভালো লাগে আর বলো
        মৌন-মুখর এই লুকোচুরি খেলা,
বিদায় নেবার সময় ঘনিয়ে এলো,
        যদি কথা থাকে বলে ফেল এই বেলা।
        আমি যা' বলিনি বলতে চাইনে আর,
        না-বলা কথার তুমি যদি নাও ভার।

'ত্রিধারা' (শারদ সংকলন) ১৩৬৬

নববর্ষ

সময়ের বৃন্ত হতে খসে গেল একটি বছর
ত্রিরিশে চৈত্রের শেষে। একটানা জীবনের পর
ফের এসে দেখা দিল আরেকটি পয়লা বৈশাখ।
বহু বর্ণহীন দিন, বহু রাত্রি নৈরাশ্যে নির্বাক—
এদের সমাধি 'পরে এলো আজ আগন্তুক রূপে
কালের যে প্রতিনিধি সৌরলোক হতে চুপে চুপে
আশা করি এনেছে সে আগামীর নতুন আশ্বাস,
চূর্ণ করে—অতিক্রান্ত জীবনের জীর্ণ অবিশ্বাস।

থাক্ থাক্ আজ তবে প্রত্যহের পঙ্কিলতা যত।
জীবনে চলার পথে যে পুণ্যাহ হলো সমাগত,
তাকে আজ হাসি মুখে অন্তরের মৌন নমস্কারে
স্বাগত জানাই, বন্ধু, জনতার পীড়িত সংসারে।
বিমর্ষ বিশ্বের বুকে নববর্ষ করুক সঞ্চার
রৌদ্র-তরঙ্গিত হর্ষ পল্লবিত সবুজ আশার।

জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৬৬

বৈশাখী

অগ্নিঝরা বৈশাখের অলস দুপুর,
সমস্ত পৃথিবী জ্বরে মূর্ছিত নির্বাক ;
চারিদিকে খাঁ খাঁ করে আরক্ত রোদ্দুর,
মাঝে মাঝে ভেসে আসে কোকিলের ডাক

জানালার ধারে শুয়ে দেখি চেয়ে চেয়ে
প্রত্যহের চলমান বিচিত্র সংসার—
কোলে ছেলে, পিঠে বোঝা বুড়ি এক মেয়ে
কুঁজো হয়ে পায়ে হেঁটে চলেছে ওধার।

দু' পাশে গাছের ফাঁকে দীর্ঘ পথরেখা
পড়ে আছে বিধবার সিঁথির সমান,
চির বিরহের রঙে যেন তাতে লেখা
একখানি হৃদয়ের নিঃশেষিত দান।

জেলেরা ঘরেতে ফেরে কাঁধে ফেলে জাল,
গাঁয়ের বধূরা করে নদীঘাটে স্নান ;
ধেনুপাল সঙ্গে নিয়ে ওপারে রাখাল
অশথ-ছায়ায় বসে গায় মেঠো গান।

গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র তরঙ্গের তালে
মাঠ ছেড়ে ছুটে চলে দিগন্ত-সীমায়,—
যেখানে দিগঙ্গনা আকাশের গালে
দু'বেলা সোহাগ ছলে আবীর মাখায়।

বিচিত্র মধুর দৃশ্যে ভরে ওঠে চোখ,
    ধীরে ধীরে জাগে মনে একাত্ম-চেতনা,
ভুলে যাই জীবনের যত দুঃখ শোক,
    বেদনা আনন্দ আনে, আনন্দ বেদনা।

জলস্থল, অন্তরীক্ষ, অপার আকাশ—
    মনে হয় আমি যেন ওরই একজন।
আমারি মনের ভাবে ভরেছে বাতাস,
    এ বিশ্ব আমারি যেন বিচিত্র স্ফুরণ।

জয়শ্রী, বৈশাখ ১৩৬৭

সকল পাওয়ার শেষে

ঠিক যেন সেই হাসি এখনো ঠোঁটের কোণে লাগা,
সশঙ্ক আনন্দ-ভরা উৎকণ্ঠায় সারারাত্রি-জাগা
তন্দ্রিল আবেশ-মাখা সেই চোখ। আগেকার মতো—
অতিথির আপ্যায়নে গৃহী হয় যেমন বিব্রত,
অস্থির সে উদ্দীপনা আজো তার সমগ্র সত্তায়
সফেন তরঙ্গ ভঙ্গে পথিকের বিভ্রম জাগায়।
বহুদিন পরে দেখা দূর থেকে, তা'ও অল্পক্ষণ,
জটিল জনতা-স্রোতে পথ বেয়ে চলেছে তখন
হয়তো সিনেমা-গৃহে, কিংবা কোনো পার্কে রেস্তোরাঁয়,
কিংবা কোনো বান্ধবীর আমন্ত্রণে সৌজন্য রক্ষায়
ছুটির বিকালে। সঙ্গে—দেহরক্ষী সারা জীবনের।
প্রহরা এড়িয়ে দেখা অলক্ষিতে, তবু তা' মনের
আকাশে সঞ্চার করে দিয়ে গেল সহসা তড়িৎ,
প্রশ্ন নিয়ে ফিরে এলো অপহৃত আমার অতীত।
পেয়েছে সে সব কিছু সমাজের চোখে যা' যা' দামী,
কখনো করেনি স্পর্শ তাকে কোনো লৌকিক নোংরামি,
তবু কেন তাকে দেখে আজকে এ কথা হলো মনে,
কী যেন পায়নি চেয়ে চলেছে সে তারি অন্বেষণে।

মাসিক বসুমতী, (নববর্ষ সংখ্যা) ১৩৬৭

মহা-স্মরণে

মারমুখী দু'শিবিরে ভাগ হয়ে গেছে এ দুনিয়া,
বহ্নিগর্ভ বিদ্বেষের বিস্ফোরণে বিষাক্ত বাতাস।
যে যার প্রাধান্য আজ প্রতিষ্ঠায় প্রয়াসে মরিয়া,
'শান্তির ললিত বাণী' মনে হয় 'ব্যর্থ পরিহাস'।
প্রীতি নেই, নীতি আছে, মানবতা—দলীয় মুখোশ,
ক্ষমতার কারাগারে মমতার হয়েছে মরণ ;
'শুধু প্রাণ ধারণের গ্লানি' ভরা চাপা অসন্তোষ
বুকে নিয়ে অহরহ দিন যাপে জনসাধারণ।

সভ্যতার এ সঙ্কটে,—দ্বন্দ্বযুদ্ধে মত ও পথের
বিভ্রান্ত এ বিশ্ববাসী অনুভব করে প্রয়োজন
অঙ্গুলি-নির্দেশ কোনো ক্রান্তদর্শী মহামানবের ;
সমগ্র জগৎ জুড়ে আজ তাই এ মহা-স্মরণ।
হে বরেণ্য বিশ্বকবি, তোমার অমৃতময়ী বাণী
হোক্ চির সত্য-শিব-সুন্দরের পথের সন্ধানী ॥

শনিবারের চিঠি, রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৬৭

নজরুল স্মরণে

কবিতা বনিতা সম আকৈশোর সহচরী যার,
অন্যায়ের প্রতিবাদে যার হাতে লেখনী দুর্বার
করেছে দুর্বাসা সম বহ্নিময়ী বাণী উদগীরণ,
দুঃখের দাহন
সঞ্চার করেছে শক্তি যার কাজে, কথায়, চিন্তায় ;
অফুরন্ত সমবেদনায়
হাতের মোহন বাঁশী ফেলে দিয়ে ধরেছে যে অসি,
নিন্দা আর প্রশংসা ভূয়সী
কণ্ঠ ভরে অকাতরে নিজে করে পান
দুখী মানুষের ব্যথা বুকে নিয়ে গেয়ে গেছে গান
বেঁধে নিয়ে মনোবীণা কোমলে কঠিনে,
আজ জন্মদিনে
সে দরদী, সে বিদ্রোহী কবিকে আমার
নমস্কার ।

জাগরণ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৬৭

প্রখর গ্রীষ্মের পরে

প্রখর গ্রীষ্মের পরে প্রথম বর্ষণ,—
বহু বঞ্চনার শেষে বাঞ্ছিতের স্পর্শ-শিহরণ।
মগ্ন হলো সারা অঙ্গ তৃপ্তির আবেশে ;
অবসন্নতার পরে প্রসন্ন প্রশান্তি।
এতদিন ধরে
আকাশে পিঙ্গল মেঘ দেখা দিয়ে হয়েছে উধাও
ব্যর্থ বাসনার মতো অনির্বাণ বেদনার দেশে
রেখে শুধু জ্বালা আর দীর্ণ হাহাকার।
দহনে দহনে আর নিয়ত শোষণে,
এসেছে নিঃশেষ হয়ে
সঞ্চিত সৃষ্টির সুধা বসুধার বুকে
সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে দিয়ে রিক্ততার গৈরিক আভাস।
মনের নির্বাক ব্যথা তার
চেয়েছে বাঙ্ময় হতে অসংযত বৈশাখী বাতাসে।
আষাঢ়ের ধারাস্নানে দহনের হলো অবসান,—
ঝিল্লি-দাদুরীর কণ্ঠে বাজে তার স্পর্ধিত ঘোষণা।
বঞ্চিতা বসুধা আজ ধন্য হোক্ পুণ্য ঋতুস্নানে
মনে নিয়ে ফসলের ধ্রুব প্রতিশ্রুতি।

শারদীয় 'যুগান্তর,' ১৩৬৭

তিলোত্তমা

বহুদিন পরে সেই আমাদের বন্ধু নিখিলেশ
চিঠিতে লিখেছে যেতে,—প্রয়োজন জরুরী বিশেষ।
বহুবাঞ্ছিতার মাঝে একজন জীবনসঙ্গিনী
শুনেছি নিয়েছে বেছে, আজো তাকে চাক্ষুষ দেখিনি।
সহপাঠী নিখিলেশ,—মনে পড়ে বহু কথা তার,
এমনিতে মুখচোরা, কেবল কথায় ছিল ধার।
উঠলে বিয়ের কথা বলতো সে—মাপ কর্ ভাই,
একটি মেয়ের মাঝে মিলবে কি আমি যা' যা' চাই?
করবীর কালো চুল, মায়াবীর মুখের গড়ন,
কবিতার কলকণ্ঠ, বিনীতার বিনীত ভাষণ,
ছন্দার মরাল গতি, নন্দিনীর হরিণী-চাহনি
পাবে যে মেয়ের মাঝে তাকেই সে করবে ঘরণী।
কল্পনার তিলোত্তমা মেলে শুধু কাব্যের পাতায়,
বস্তুহীন নাম ওটা তাকে তা' বোঝানো ছিল দায়।

সেই নিখিলেশ আজ গিয়ে দেখি অসুস্থ শয্যায়,
কৃশাঙ্গী মহিলা এক পাশে বসে নিরত সেবায়।
অচেনা আমাকে দেখে তিনি উঠে গেলেন আড়ালে
আদরে দিলাম হাত নিখিলের আতপ্ত কপালে।
দু'হাতে আমার হাত টেনে নিতে বুকের উপর
নিখিলের চোখ বেয়ে নেমে এলো ধারা দর্‌দর্।

সেবিকার পরিচয় বলে গেল আকারে ইঙ্গিতে—
ও হলো হালের মাঝি নিখিলের জীবন-তরীতে।
নিখিলেশ আর আমি—বহুদিন পরে মুখোমুখি,
দু'জনের মনে আজ অতীতের স্মৃতি দেয় উঁকি।
অনেক কথার পরে বলে—তুই চিনেছিস্ ওকে?
ও যে কী অদ্ভুত মেয়ে দু'কথায় বোঝাবো কি তোকে।
আমার জীবন জুড়ে ওর ত্যাগ, ওর সেবা, ক্ষমা,
তাই তো আদর করে ওকে আমি বলি—তিলোত্তমা।
নিখিলের কথা শুনে মনে এলো অনেক কথাই,
বিস্ময়ে কিছু না বলে, বললাম—সুখে থাক্ ভাই।

শারদীয়া বসুমতী, ১৩৬৭

অপরাজিতা

কী পেলো তা' সে-ই জানে, কিন্তু কিছু পেয়েছে সে ঠিক,
তোমরা সবাই মিলে যত তাকে দাও না ধিক্কার ;
সঙ্কোচের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে সে আজকে নির্ভীক,
অবশেষে করেছে সে বাঁচবার পথ আবিষ্কার।

দুঃসময় কাটিয়ে সে সুদিনের পেয়েছে নাগাল,
আর সে পায় না ভয় তোমাদের প্রকাশ্য নিন্দায় ;
আপন যাদের চোখে এতকাল ছিল সে জঞ্জাল,
আজ তারা অকারণে পঞ্চমুখ তার প্রশংসায়।

তাকে দেখে আজ কেউ অবজ্ঞায় ফিরায় না মুখ,
ঘর ছেড়ে পথে এসে ধীরে ধীরে বেড়ে গেছে দাম ;
তার সঙ্গলাভ লোভে কতজন গোপনে উৎসুক,
দরজায় ঘোরে গাড়ি, কাগজে কাগজে ছবি, নাম।

অথচ আমি তো জানি ওর আগেকার ইতিহাস—
দেখতে সুন্দরী নয়, কালো রঙ, দোহারা গড়ন,
সারা অঙ্গ ছেয়ে ছিল যৌবনের বিনম্র আশ্বাস,
দু' চোখে ছড়ানো ভাবী জীবনের গার্হস্থ্য স্বপন।

যে-মেয়ে রূপসী নয়, জোর নেই বাবার টাকার,
এ সমাজে সে-মেয়ের কবেই বা চাহিদা তেমন ;
কত পাণিপ্রার্থী তাই চলে গেল মুখ করে ভার,
দেখলো সে ম্লান মুখে দুরাশার ব্যর্থ আয়োজন।

তবু সে মানেনি হার, অবশেষে হলো তারি' জয়,
গণমান্য কত লোক তার কাছে করে আনাগোনা ;
হয়তো অযোগ্য বলে অনেকেই পায় না প্রশ্রয়,
আজ সে মর্যাদা দিয়ে কাউকেই করে না কামনা।

সপ্তর্ষি (কার্তিক-পৌষ) ১৩৫৭

আশ্চর্য দিন

এমন আশ্চর্য দিন অতর্কিতে আসে এ জীবনে,—
যেদিন কাজের ফাঁকে বারংবার নিরুদ্বিগ্ন মন
দোয়েল পাখির মতো শিস দিয়ে ওঠে অকারণে,
যত দুঃখ বেদনার ধীরে ধীরে ঘটে বিস্মরণ।

চাওয়া নয়, চেয়ে থাকা, পাওয়া নয়, শুধু পেতে চাওয়া,
কাজ নয়, কথা নয়, ভালো লাগে মৌন ব্যাকুলতা ;
মাটির অঞ্চল ছেড়ে চঞ্চল মেঘের পিছু ধাওয়া,
অন্তর মুখর তবু সারা অঙ্গে আপাতস্তব্ধতা।

একমুঠো মেঠো হাওয়া হঠাৎ-খুশীর মতো এসে
দুশ্চিন্তার কালো মেঘ নিয়ে যায় নিমেষে উড়িয়ে ;
নতুন আশার আলো দিগন্তের শান্ত কোণ ঘেঁষে
উঁকি দেয় চুপি চুপি অন্তরের বাসনা জাগিয়ে।

বিষয়ী চেতনাপুঞ্জ ম্রিয়মাণ হয়ে আসে ধীরে,
অতর্কিতে কাটে তাল প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার ;
বাস্তবে বিস্মৃত মুখ কল্পনায় আসে ফিরে ফিরে,
লাভ-ক্ষতি, নিন্দা-খ্যাতি, মনে হয় সমস্ত অসার।

এমন আশ্চর্য দিন,—বারংবার আসে না যদিও,
অলক্ষ্যে মনের মাঝে হয়ে থাকে চিরস্মরণীয়।

শনিবারের চিঠি, পৌষ ১৩৬৭

একটি গ্রামের স্মৃতি

কত স্মৃতি মুছে গেছে, কত কথা অলীক কল্পনা,
একটি গ্রামের স্মৃতি আজো করে সহসা উন্মনা।
সভ্যতার রূপসজ্জা আজো তাকে করেনি কৃত্রিম,
এখনো সে রমণীয় নিয়ে তার আকৃতি আদিম।
গেরুয়া মাটির কোলে বিহারের একখানি গ্রাম,
নিখুঁত ছবির মতো রসিকের নয়নাভিরাম।
দিগন্তে নীলের নীচে পাহাড়ের ঘন সন্নিবেশ,—
সে যেন ঘুমের শেষে সদ্য-দেখা স্বপ্নের আবেশ।
সর্পিল বন্ধুর পথ ঘুরে ঘুরে চলে গেছে দূরে
প্রৌঢ় ফসলের ক্ষেত পার হয়ে কোন্ স্বপ্ন পুরে।
আমন ধানের ঘ্রাণে অঘ্রানের হৈমন্তী বাতাস
জাগায় গ্রামীণ মনে জীবনের নিশ্চিত আশ্বাস।
নিবিড় স্তব্ধতা মাঝে শব্দ বাজে পাতার মর্মরে,
অ-ত্রস্ত পথের বুক জনতা ও যানের ঘর্ঘরে।
আকাশ মাটির বুকে নীল আর হরিতের মেলা
দু'চোখে প্রশান্তি আনে প্রান্তে আর অপরাহ্ণ বেলা।
সেখানে নিসর্গ সে যে স্বর্গের বিশ্বস্ত প্রতিনিধি,
প্রসারিত করে দেয় প্রবাসীর মনের পরিধি।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

শহরতলি

শহরের বুক নয়, শহরতলির এক ধার,
কাঁকরের পথ বটে, তবু তার দু'পাশে বিস্তার
সবুজ ঘাসের গুচ্ছ,—মাটির মর্মের অনুভূতি
মানুষের মর্ম মাঝে সঞ্চারের শোভন প্রস্তুতি।
শহরে প্রকৃতি নেই, আছে তার অস্থি ও কঙ্কাল,
তা' নিয়ে রচিত যত অট্টালিকা, সৌধ সুবিশাল।
পায় না আকাশ মাটি হৃদয়ের সহজ স্বীকৃতি,
ঘরে ঘরে নির্বাসিত প্রকৃতির ব্যর্থ অনুকৃতি।

এখানে আকাশ মাটি প্রতিদিন পরিবর্তমান,
প্রকৃতি রচনা করে ঋতুবদলের পালাগান
ফুলের আসরে বসে পাখিদের কাকলি-গাথায়,
ডাক পড়ে মানুষের প্রকৃতির প্রমোদ-সভায়।
এখানে প্রত্যহ প্রাতে আলোর প্রথম আশীর্বাদ
ঘুচায় সমস্ত গ্লানি, বিগত রাত্রির অবসাদ।

শারদীয় মধুরাংশু, ১৩৬৭

শেষ পরিণতি

মনে পড়ে মনীষাকে, অরুণার বান্ধবী মনীষা—
স্বভাব-চঞ্চল মেয়ে আগুনের বিগ্রহ সদৃশা।
অঙ্গে তার অনঙ্গের আরত্তির দৃপ্ত অঙ্গীকার,
সে যেন—আনন্দঘন কামনার কায়িক বিস্তার।
কবির জীবন-কাব্যে অরুণাই তখন নায়িকা,
মনীষা সঙ্গিনী তার—মূলের যেমন পাদটীকা।
কাহিনী এগিয়ে চলে নিয়ে নিত্য ঘাত প্রতিঘাত,
মনীষা সঙ্কটক্ষণে করে যায় আলোক-সম্পাত।
নবীন কবির মুগ্ধ অগভীর, সহজ কল্পনা
সে-আলোকে ফিরে পায় আবার নতুন উদ্দীপনা।

বহুদিন হয়ে গেল, সব কথা হয় না স্মরণ,
তারপর একদিন, মনে পড়ে অরুণা কখন
অসতর্ক কল্পনায় অতর্কিতে দূরে গেল সরে,
মনীষা সেখানে এলো নব নায়িকার মূর্তি ধরে।
মনীষা অরুণা নয়, দু'মেরুর বাসিন্দা দু'জনে ;
কবির লেখনী তাই মনীষার চরিত্র-চিত্রণে
নতুন উদ্যম নিয়ে ধীরে ধীরে হলো অগ্রসর,
কে জানে কী অভিমানে মনীষা দিল না অবসর।
কবির কল্পনা নিয়ে খেলা করে কিছুদিন ধরে,
বিদ্যুতের বেগে এসে ঝঞ্ঝার আবেগে গেল সরে।
টানা হলো মাঝপথে সে-কাব্যের শেষ পরিণতি,
অসমাপ্ত রয়ে গেল অনঙ্গের আরব্ধ আরতি।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

সৃজন

এখনো আসেনি ঘুম, ছুটো বাজে ঘড়িতে এখন,
তুমিও কি জেগে আছ এত রাতে আমারি মতন,
জানালার ধারে বসে বুকে চেপে বেদনা বিশাল
ভাবছ আমারি মতো মনে মনে আকাশ-পাতাল ?
অস্তমিত অতীতের স্বপ্নময় গোপন দুরাশা,
প্রাণের গভীরে নিত্য কারো কাছে নীরব প্রত্যাশা,
চাওয়া নয়, অকারণে তবু কারো পথ চেয়ে-থাকা,
কুমারী মনের পটে চুপি চুপি কারো ছবি আঁকা।

হয়তো সে-কথা ভেবে আজ আর নও তুমি খুশী,
হয়তো ভাবছ বসে করেছিলে কী ছেলেমানুষি !
কল্পনা-রঙীন সেই জীবনের প্রথম অধ্যায়
আজকে স্মরণ করে মরে যাও হয়তো লজ্জায়।
অথবা কিছুই নয়—এ আমার মনের সৃজন,
এখন নিশ্চয় তুমি মহাসুখে ঘুমে অচেতন।

শারদীয় কথাসাহিত্য, ১৩৬৭

অন্য কোনো গ্রহলোকে

মাঝে মাঝে মনে হয় চলে যাই অন্য কোনোখানে
পুরানো পৃথিবী ছেড়ে অন্য গ্রহ তারকার দেশে ;
বায়ুস্তর পার হয়ে আকাশের আরো কাছাকাছি—
সৌর সমাজের কোলে অজানিত ভিন্ন পরিবেশে।
জরতী পৃথিবী আজ বর্বরের বিজয়-শিবির,
দ্বারপ্রান্তে তার মূক মানবতা চরম লাঞ্ছিত ;
কানাকানি, হানাহানি, অমূলক সন্দেহ বিদ্বেষে
জীবনের অগ্রগতি পদে পদে নিয়ত বিঘ্নিত।

মানুষের তাজা রক্তে এ গ্রহের মাটি গেছে ভিজে,
এখানে লোভে ও ক্ষোভে অহরহ প্রাণান্ত সংগ্রাম ;
সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা—সে কেবল গাল-ভরা কথা,
বাহুবলে অত্যাচারী ইতিহাসে রেখে যায় নাম।
মাটির মানুষ তাই মত্ত আজ শূন্য অভিযানে,
অন্য কোনো গ্রহলোকে অনাবিল শান্তির সন্ধানে।

শনিবারের চিঠি (পূজা-সংখ্যা), ১৩৬৭

আয়োজন

জীবন সীমিত, তবু কী আশ্চর্য ! বাসনা অসীম
অহরহ ক্ষুব্ধ করে হৃদয়ের প্রশান্তি গভীর।
অনির্দেশ্য বেদনার মৌন আলোড়ন
অলক্ষ্যে শিথিল করে দৃঢ় ভিত্তি আত্মপ্রতীতির।
যা' পাই নি তা'ই শুধু কল্পনায় ওঠে বড়ো হয়ে,
তুচ্ছ হয় তার কাছে পেয়েছি যা' তার যত স্মৃতি।
না-পাওয়ার নিরানন্দ পাওয়ার আনন্দ করে ম্লান,
ক্ষুণ্ণ করে জীবনের সহজ বিস্তৃতি।

সীমিত জীবন—তার যাপনের কত আয়োজন,
কত প্রতারণা আর কত প্রবঞ্চনা,
কানাকানি, হানাহানি কত ক্ষোভ গ্লানি
নিয়ত বিঘ্নিত করে সুন্দরের মুগ্ধ আরাধনা।
আশ্চর্য ! তবুও কারো কাম্য নয়, বাসনা-বিরতি,—
স্তব্ধ হয়ে যায় পাছে জীবনের গতি।

সমাবেশ (৩য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা) ১৩৬৭

জৈব

একদিন মনে হতো তাকে ছাড়া জীবন দুর্ভর,
আকাশে তারার ভিড়ে একমাত্র সে-ই ধ্রুবতারা ,
দুঃসাহসে পাড়ি দিতে অতলান্ত সংসার-সাগর
পথের দিশারী তার দু'চোখের নিঃশব্দ ইসারা ।
সেদিন জীবন ছিল - ভাবনার ভারলেশহীন
ভাবের মাধুরী-স্পর্শে মোহময় বাস্তব জগৎ,
শারদ মেঘের মতো দুরাকাঙ্ক্ষা আকাশে উড্ডীন···
তাই তো সহজ ছিল প্রতি পদে কঠিন শপথ ।

সে আসেনি—এই ক্ষোভে আকাঙ্ক্ষার হয়নি উদ্‌গতি,
জৈব জীবনের ধারা তবু আজো আছে অব্যাহত ;
আমাদের এ বিচ্ছেদে প্রকৃতির হয়নি কো ক্ষতি,
দাগ যদি থাকে থাক, শুকিয়ে গিয়েছে সেই ক্ষত ।
যে এসেছে, বড়ো করে দেখি আজ তারি গুণপনা,
ব্যর্থ মন এরই মাঝে খুঁজে পায় বাঁচার সান্ত্বনা ।

অমৃত, ১৮ই আশ্বিন সংখ্যা, ১৩৬৭

যদি

নিভে গেলে সব আলো অতর্কিতে দুরন্ত বাতাসে
মগ্ন হলে এ পৃথিবী ঘন অন্ধকারে,
তোমার চোখের আলো নভোচারী জ্যোতিষ্কের মতো
জেগে থেকে অনির্বাণ সংসারের সমুদ্র-শিয়রে
অবিরাম ইসারায়
দূরের নির্ভুল পথ নিঃশব্দে দেখায়।

স্তব্ধ হলে সব হাওয়া প্রাঙ্গনে প্রান্তরে—
ঘরের পাশের গাছে যে সময় নড়ে না পাতাটি,
মৃদু ছন্দে মর্মরিত তোমার নিশ্বাস
দুঃসহ মুহূর্তখানি করে লঘুভার।

শেষ হলে সব কথা, শেষ হলে সব কোলাহল
যখন গভীর মৌন অধিকার করে সারা ঘর,
তখন তোমার ছোঁয়া—প্রসন্ন নীরব
আবার জাগাতে পারে অফুরন্ত কথার জোয়ার।
সব গ্লানি মুছে যায়, সব গ্লানি ঘোচে
মূর্তিমতী পাওয়া তুমি সর্বক্ষণ যদি থাকো কাছে।

রচনা : শ্রাবণ, ১৩৬৭

রৌদ্রদগ্ধা

মনের সমস্ত কথা বলা হয়ে গেলে,
মুখোমুখী বসে-থাকা শুব্ধ অবসর
সহসা যেমন করে হয়ে ওঠে ভারী
অনির্দেশ্য বেদনায়,—
রৌদ্রদগ্ধা এ পৃথিবী ঠিক সেইভাবে
চেয়ে আছে বৃষ্টি-হারা আকাশের দিকে
নিষ্ফল প্রার্থনা শেষে নিরুপায় প্রার্থীর মতন।
ক্ষুধায় কাতর কণ্ঠ, সারা দেহ উত্তাপে জর্জর,
নিদ্রাহীন দুই চোখ দুঃস্বপ্নের আতঙ্কে পাণ্ডুর,
আশ্বাসের ছায়া নেই, খাঁ খাঁ করে আরক্ত রোদ্দুর,
আকাশে বর্ষণহীন গর্বিত গর্জন।
দেয় নি সে কোনো কিছু, তবু সে করেনি প্রত্যাখ্যান—
সাময়িক কালো মেঘ মাঝে মাঝে আনে এ বিশ্বাস;
কদাচিৎ চকিত তড়িৎ
জাগায় মনের কোণে
পূর্বতন দাক্ষিণ্যের প্রায়-ভুল-হয়ে যাওয়া স্মৃতি।
দহন অনেক হলো, সমাগত ফসলের দিন,
তবু কি আগের মতো এখনো সে রবে উদাসীন?

মাসিক বসুমতী, আষাঢ়, ১৩৬৭

রাণুকে ঘুমাতে দাও

রাণুকে ঘুমাতে দাও,
জীবনে ও সয়েছে অনেক,—
অনেক বঞ্চনা আর ঘরে পরে অনেক লাঞ্ছনা।
সয়ে সয়ে তিলে তিলে অস্থি-মাংস হয়ে গেছে ক্ষয়।
রাণুকে ঘুমাতে দাও
কঠিন কঙ্কর-ভরা দীর্ঘ পথ-পরিক্রমা শেষে
দেহ ওর চায় আজ নিশ্চিন্ত বিশ্রাম;
থাক্ থাক্, ডেকো না রাণুকে।
তোমরা জানো না কেউ ওর জীবনের ইতিহাস,
আমি জানি কিছু কিছু, যদিও সে দেয়নি আভাস।
রূপ-রস-গন্ধে ভরা এ ধরার আনন্দ-উৎসবে
সে-ও দিয়েছিল সাড়া অনেকের মতো।
পাথেয় ছিল না বেশী—
অথচ পথের নেশা মনে তার ছিল দুর্নিবার!
সে নেশার টানে
জীবন-সরণী বেয়ে চলেছে সে যতদূর পারে;
কখনো এসেছে নিন্দা, কখনো বিদ্রূপ,
হৃদয়ের বিনিময়ে কখনো বঞ্চনা।
সয়েছে সে সব গ্লানি সর্বংসহা বসুধার মতো।
মনে বাসনার বোঝা দিনে দিনে হয়েছে দুর্বহ,
চলেছে সে তাই নিয়ে; তারপর সহসা কখন
শ্রান্তিতে চোখের পাতা এসেছে জড়িয়ে।
থাক্, থাক্, বিরক্ত কোরো না ওকে;
নিশ্চিন্তে ঘুমাতে দাও বেচারী রাণুকে।

শারদীয় মধুরাগস্ক, ১৩৬৭

বিবেকানন্দ-স্মরণে

আরও বিবেক চাই, প্রতি কাজে জাগ্রত বিবেক,
মনোরাজ্যে মর্ত্যবাসী মানুষের পুণ্য অভিষেক।
চাই না ন্যায়ের নামে প্রীতিহীন নীতির ছলনা,
অক্ষম ক্লীবের মতো স্বার্থপর ভণ্ডের বন্দনা।
আরও আনন্দ চাই—যে-আনন্দ বীর্যে বলীয়ান,
মাটির পৃথিবী করে যে-আনন্দে নিত্য সূর্যস্নান,
অকারণ হাসি হয়ে যে-আনন্দ ফোটে শিশুমুখে,
জাগায় বাঁচার আশা যে-আনন্দ বঞ্চিতের বুকে।

তুমি ছিলে সে-বিবেক, সে-আনন্দ মর্ত্যে মূর্তিমান।
রিক্তবিত্ত অনাদৃত যারা এই মাটির সন্তান,
দেখেছ তাদেরি মুখে নররূপে ঈপ্সিত ঈশ্বরে,
জীব-প্রেম শিব-সেবা,—এ প্রত্যয় জাগ্রত অন্তরে
সে-বিবেক অন্তর্মন্ত্র, সে-আনন্দ অতীত স্বপন,
নিঃশব্দ শতাব্দী অন্তে আজ তাই সোচ্চার স্মরণ।

শনিবারের চিঠি (বিবেকানন্দ-সংখ্যা), ১৩৬৭

ইতিহাস

আজ তুমি ইতিহাস, নও শুধু কায়াময়ী স্মৃতি,
নও আর কল্পলোকে কামনার কায়িক বিস্তৃতি।
আজকে তোমাকে ঘিরে আদি কৌতূহল অবসান,
জীবনের গল্পলোকে করি তাই তোমার সন্ধান।
সেদিন কবির চোখে রূপে গুণে ছিলে তিলোত্তমা,
এখন নিজেই তুমি অভিনব তোমার উপমা :
আজকের এই তুমি সেদিনের 'তুমি'র বদলে—
তরু-জীবনের যেন রূপান্তর, ফুল থেকে ফলে।
রূপের চাতুরী নেই, গন্ধের গৌরব অবসান,
রূপ আর গন্ধ মিলে করেছে রসের জন্মদান।
ভোজের আসরে তার না থাকে না থাক্ সমাদর,
জীবনের মরুপথে সে-ই পান্থপাদপ-নির্ঝর।
আজ তুমি ইতিহাস—সার্থক এ অভিধা তোমার,
আমারি কাহিনী নিয়ে বিরচিত অধ্যায় সম্ভার :
পদে পদে নানা বাধা, তবু আশা, তবু দীর্ঘশ্বাস,
বহু ব্যর্থ প্রয়াসের সাক্ষী তুমি—তুমি ইতিহাস।
কবি-কাহিনীর এই অনিবার্য ক্রম পরিণতি
আজকে তোমার মাঝে খুঁজে ফেরে শৃঙ্খলা সঙ্গতি।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

ঘুড়ি ওড়ে

ঘুড়ি ওড়ে।
অনুকূল হাওয়া তাকে ওড়ায় ওঠায়
মাটির আঙিনা থেকে শূন্যে প্রায় আকাশ সীমায়
সব বাধা, সব পিছুটান
দুরন্ত হাওয়ার বেগে মুহূর্তে নিঃশেষে অবসান।
ঘুড়ি ওড়ে।
অদূরে অদৃশ্য হাতে একজন সুতো থাকে ধরে।
ঘুড়ি ওড়ে।
ওঠে আর নীচে ফিরে চায়
মাটির মানুষ আর কেউ তার নাগাল না পায়।
কিছু অহমিকা, কিছু দুরাশায় মেশা
ওঠার সে নেশা
অলীক ভাবনা জালে ঘিরে ফেলে সারা মন তার-
অতর্কিত এ উত্থান, এ যেন আজন্ম অধিকার।
যারা রয়ে গেল নীচে
তাদের ওঠার দাবি তার কাছে মনে হয় মিছে।
মনে হয়—পেয়ে গেছে তারা 'যা' পাবার ;
কে আছে এ দুনিয়ায় সমকক্ষ তার ?

ঘুড়ি ওড়ে।

ঘুড়ির এ ভুল
ভাঙতে হয় না দেরি হাওয়া যবে বয় প্রতিকূল।
সময়ের খেয়ালী খেলায়
যে-হাওয়া উঠিয়েছিল, সে-ই তাকে আবার নামায়
ঘুড়ি নামে—
নামে আর মাঝে মাঝে থামে।
তখনো ওঠার নেশা জুড়ে থাকে মন—
ধাপে-ধাপে নেমে-আসা নিশ্চিত যখন।
ঘুড়ি-জীবনের সেই চাপা বেদনার ইতিহাস
মাটি-ই স্মরণে রাখে, রাখে না আকাশ।

শনিবারের চিঠি, (পূজা সংখ্যা) ১৩৬৭

ট্রাম চলে

ট্রাম চলে।
পথের দু'ধার থেকে লোকজন দেখে কৌতূহলে
দুর্বহ বোঝার ভার বুকে নিয়ে চলে আর থামে,
দৈনন্দিন জীবন-সংগ্রামে।
শীত-গ্রীষ্ম, ঝড়-জল দুই পায়ে দলে
রোজ ট্রাম চলে।
টেনে টেনে শ্রান্ত দেহভার
ছক-বাঁধা পথ বেয়ে অবিরাম আনাগোনা তার
প্রথম প্রত্যুষ থেকে রাত্রি দ্বিপ্রহর,—
কখনো ত্বরিত গতি, কখনো মন্থর।
চৌরঙ্গী-চত্বর হয় নিরালা নিঝুম,
সুখী দম্পতির চোখে নেমে আসে ঘুম,
তখনো সে ক্ষয়ে-যাওয়া চাকার ঘর্ঘরে
নির্জন পথের মৌন শান্তিভঙ্গ করে।

ট্রাম চলে, রুজির সন্ধানে চলে ট্রাম,
মাথা থেকে পায়ে ফেলে ঘাম।
তিলে তিলে দেহ করে ক্ষয়
নাগরিক জীবনের প্রাত্যহিক পাথেয় সঞ্চয়।
মনে মনে প্রতি পদে নৈরাশ্য সঞ্চার···
বাঁচার আগ্রহ তবু দুরন্ত দুর্বার;
ট্রাম যেন—মধ্যবিত্ত জীবনের প্রমূর্ত প্রতীক,
মেহনতী মানুষের মরমী শরিক।

শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৬৭

এ মহানগরী

যামিনী তৃতীয় যামে,
থেমে গেছে রাজপথে যান-চলাচল ;
মেহনতী মানুষের কল কোলাহল
নীরব হয়েছে পথে। প্রাত্যহিক জীবন-সংগ্রাম
অসহ শ্রান্তির ভারে ক্ষান্ত কিছুক্ষণ।
চলেছি বাড়ির পথে পায়ে হেঁটে একা অন্যমনে।
আজব জীবিকাপুরী, চির-চেনা এ মহানগরী
সহসা নতুন রূপে হলো উদ্ভাসিত :
মনে হলো যেন—
গভীর রাতের এই ঘুমন্ত নগরী
পড়ে আছে নর্মশ্রান্ত নাগরীর মতো
অঙ্গে নিয়ে সদ্য বহু বল্লভের পীড়নের স্মৃতি।
আলোকের স্তম্ভগুলি— যেন ওরা অতন্দ্র প্রহরী
চেয়ে আছে চোখে নিয়ে অবাক বিস্ময়।
পা-পথে রয়েছে শুয়ে নিরাশ্রয় মানুষের দল
জীবনের কুরুক্ষেত্রে প্রত্যহের পরাস্ত সৈনিক।
তিলে তিলে নিজে হয়ে ক্ষয়
প্রত্যহ ওরাই গায় সভ্যতা ও সমাজের জয়।
নাগরিক জীবন-উৎসবে
ওরা নিত্য প্রয়োজন, তবু ওরা পড়ে থাকে নীচে
ওরা ইতিহাস—
হর্ম্যময়ী নগরীর মর্মভেদী উষ্ণ দীর্ঘশ্বাস।

'সমাবেশ' শারদীয় ১৩৬৭

জাগরণ

আমাদের এই জাগরণ—
এ এক প্রত্যয় থেকে আরেক প্রত্যয়ে উত্তরণ।
সত্য-শিব-সুন্দরের ধ্যান-ভাঙা চোখে
অতর্কিতে জেগে ওঠা সংশয়ের বিমূঢ় আলোকে
কণ্ঠে নিয়ে নব অঙ্গীকার,
না করে স্বভাবসিদ্ধ প্রত্যয়ের পূর্ণ প্রত্যাহার।
আমাদের এই জাগরণ
এ শুধু প্রস্তুতি নয়, সুকঠোর আত্মসমীক্ষণ।
এখনো আদিম বর্বরতা
আশ্চর্য! বিস্মিত করে দেশে দেশে শান্তি ও সভ্যতা
এখনো সাম্রাজ্যবাদী লোভ
বিশ্বব্যাপী গণচিত্তে জাগায় বিক্ষোভ।
এতকাল ধরে যারা মৈত্রী আর প্রীতির পূজারী,
বুদ্ধ-গান্ধী-কবিগুরু যে জাতির পথের দিশারী—
তাকে আজ নিতে হবে কঠিন শপথ
সযত্নে স্মরণ রেখে জাতীয় আপৎ।
প্রাণ বলো, মান বলো, সবচেয়ে খাঁটি—
জীবন্ত জাতির কাছে, স্বদেশের মাটি।

শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৬৭

কিছুক্ষণ

এখানে অনেক আলো, রোদে-ভেজা হাওয়া করে ভিড়
উপরে আকাশ নীল, নীচে মাটি মমতা-নিবিড়।
ঊর্ধ্বমুখী প্রতীক্ষার ফাঁকে ফাঁকে সূর্য সাক্ষী করে
এখানে সবুজ ঘাস পান্থজনে আতিথ্য বিতরে।

এখানে প্রকৃতি নেই, আছে প্রকৃতির অনুকৃতি,
নাগরিক পরিবেশে ক্ষণেকের বাঞ্ছিত নিভৃতি।
এখানে পথিক পাখি মহানন্দে পাথেয় সন্ধানে
দু'দণ্ডের অবসর ভরে তোলে স্নিগ্ধ কলগানে।

এখানে উৎসুক চোখ দেয়ালের মানে না শাসন,
চঞ্চল শিশুর দল সদ্য-ফোটা ফুলের মতন
ছড়ায় দু'হাত ভরে অনাবিল অকৃপণ হাসি
না হয়ে কখনো তারা কারও কাছে কিছুর প্রত্যাশী।

এখানে ছুটির দিনে ঘর ছেড়ে একা আসি চলে
নিজেকে একান্ত করে কিছুক্ষণ কাছে পাবো বলে।
মনের সমস্ত গ্লানি মুহূর্তেই করে দেয় দূর
ত্রিকোণ পার্কের এই মায়াঘন পড়ন্ত দুপুর।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

স্বর্গাদপি

তোমাকে ভুলিনি আমি· জননীপ্রতিমা জন্মভূমি,
অমেয় মমতাময়ী, স্বর্গাদপি গরীয়সী তুমি!
আজ তুমি বিদেশিনী, সীমান্তের লৌহ বেড়াজাল
দু'জনের মাঝখানে রচেছে অসহ অন্তরাল।
কতদিন হয়ে গেল তোমাতে আমাতে দেখা নেই,
পরিবর্তনের স্রোতে ভাসমান আজ উভয়েই;
তুমি আজ বর্ষীয়সী,—জরাজীর্ণা বেশবাসে কেশে,
আর আমি উপনীত যৌবনের সীমান্ত প্রদেশে:
সে-দিনের সেই-আমি, এই-আমি এক না যদিও
তবু সে অতীত কথা মনে আজো অবিস্মরণীয়
বহুভারে জর্জরিত জীবন দুর্বহ মনে হলে
ইচ্ছা করে ফিরে যাই তোমার সে স্নেহ-মাখা কোলে।
পরম সুখের দিন, জীবনের পরিতৃপ্ত সাধ
এখনো কামনা করে তোমার অলক্ষ্য আশীর্বাদ;
চরম দুঃখের দিনে হৃদয়ের স্তিমিত কামনা
তোমাকে স্মরণ করে ফিরে পায় নব উদ্দীপনা।
বেগবতী নদীতটে ফেলে-আসা শৈশব কৈশোর
অবসন্ন অবসর করে তোলে আনন্দে বিভোর।
কোনোদিন এ জীবনে হয়তো হবে না দেখা আর,
প্রণাম জানাই তাই তোমার উদ্দেশে বারংবার।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

মহালগ্ন

কত দিন, কত মাস, কত বর্ষ হ'য়ে গেল পার,
এখনো হয় নি ক্লান্ত ধরিত্রীর সূর্য-অভিসার ;
সুধাকর-সন্দর্শনে লীলায়িত তরঙ্গ-উচ্ছ্বাস
এখনো আগের মতো সমুদ্র-হৃদয় করে গ্রাস।
শুধু আমাদেরি মাঝে আজকে দুস্তর ব্যবধান
স্মৃতির বিদ্যুৎশিখা মাঝে মাঝে শুধু কম্পমান।

রূপ-রস-গন্ধে-ভরা পৃথিবীতে প্রীতির মেলায়
দু'জনের পরিচয় অনঙ্গের মুক্ত আঙিনায় :
অতর্কিতে শরাহত দু'বনের ত্রস্ত দু'টি পাখি,
পরম আশ্বাসভরে পরস্পর বাঁধলুম রাখী।
সেদিন জাগর স্বপ্নে তোমার পাইনি খুঁজে সীমা,
ঊনবিংশ বসন্তের রসঘন লাবণ্য-প্রতিমা।
বহ্নিমুখী পতঙ্গের দুর্নিবার দুরন্ত উল্লাস
সেদিন সমস্ত মন দু'জনের করেছিল গ্রাস।

প্রথম সে প্রণয়ের পুলকের পুষ্পিত প্রলাপ
আগ্নেয় নির্ঝরময় হৃদয়ের উত্তাল উত্তাপ,
মনে মনে চুপি চুপি বার বার নাম উচ্চারণ,
এখনো সর্বাঙ্গে মনে জাগায় আশ্চর্য শিহরণ।
পৃথিবীর সব গান, সব আলো যেন সঙ্গোপনে
মূর্ত হয়ে উঠেছিল তোমার কণ্ঠে ও দু'নয়নে।
সে-দিন, সে-মহালগ্ন জানি আর আসবে না ফিরে,
প্রীতির প্রাসাদ থেকে বন্দী তুমি স্মৃতির মন্দিরে।

শনিবারের চিঠি (কবিতা-সংখ্যা), ১৩৬৭

অনেক দেখেছি ভাই

অনেক দেখেছি ভাই, আরো কত দেখে যেতে হবে
জানি না নীরবে।
দেখে দেখে ক্ষুব্ধ স্নায়ু, পীড়িত চেতনা,
আচ্ছন্ন করেছে মন অশিব ভাবনা।
দেখেছি অনেক কিছু—রক্তক্ষয়ী মহাবিস্মরণ,
কত রাজ্য রাজন্যের উত্থান পতন,
সংগ্রামে সংঘর্ষে ত্রাসে মুমূর্ষু সভ্যতা,—
মানবের কারাগারে বুদ্ধবন্দী হলো মানবতা।
আগস্ট বিপ্লবে
দেখেছি সেদিন পুণ্য মৃত্যু-মহোৎসবে
মাতৃ-মুক্তিপণ-মত্ত তরুণের আত্মবিসর্জন,
ছিন্ন করে—সুখ-শান্তি-আরামের পেলব বন্ধন।
যারা সুধী, যারা সাবধানী
হাসিমুখে, খুশি মনে হয়ে যুক্তপাণি
অত্যাচারী বিদেশীর করে জয়গান
তোষণের বিনিময়ে কৃপা-ভিক্ষা করেছে সন্ধান।

তারপর দেখেছি পঞ্চাশে
একদিকে শোষণ-উল্লাসে
সাদা ও কালোয় মিতালির জের।
অন্যদিকে দু'ধারে পথের
নিরন্ন ও অর্ধনগ্ন কঙ্কালের জীবন্ত মিছিল।
শবলোভী শকুনি ও চিল
গোপনে করেছে সন্ধি রূপালোভী নরপশু সাথে।

তারপর আর এক আগস্টের রাতে
সাম্রাজ্যের গর্ভ থেকে জন্ম নিল যমজ স্বরাজ।
পৌণে দু'শ বছরের যত গ্লানি লাজ
ভেসে গেল মুহূর্তের পুলক-বন্যায় ;
জাতির জীবন-গ্রন্থে যুক্ত হলো নতুন অধ্যায়।
ধীরে ধীরে স্বপ্ন-শিশু রূপ নিল কঠোর বাস্তবে
হর্ষ-কলরবে
অগণ্যের ঘর যবে আনন্দ-মুখর
দু'দিগন্তে কারা যেন হলো যাযাবর।
শুরু হলো আবার মিছিল—
বেদনা আতঙ্কে তার দু'চোখ পঙ্কিল।
যাযাবরী জনতার সেই আনাগোনা
কতকাল গেল তবু ক্ষান্ত যে হলো না।
তারপর একে একে অতিক্রান্ত উনিশ বছর।
ব্যয় হলো ঋণ-করা বাগর্থ বিস্তর।
সুখ-শান্তি আজো তবু দূরপরাহত,
ঘুমন্ত জনতা তাই দিকে দিকে আবার জাগ্রত।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা ১৩৬৭

কামনা

সেদিন যেমন ছিল তেমনি রয়েছে বসুন্ধরা—
আকাশ প্রশান্ত নীল, তটিনী তেমনি কলস্বরা ;
বর্ষে বর্ষে ঋতুচক্রে বর্ষা-বসন্তের আবর্তন,
আনন্দ-বেদনা-রসে এখনো উতলা করে মন।
প্রত্যহের প্রেক্ষাপটে নিত্য পালা চলেছে বদল,
কামনার কল্পলোকে আজো তবু পড়েনি অর্গল।
অতীত সেখানে এসে চুপি চুপি করে আনাগোনা
কোন্ সে হারিয়ে-যাওয়া বাঞ্ছিতার চরণচারণা
এখনো মাতায় মন অকারণ অলীক স্বপনে—
সত্যকে আবৃত করে মিথ্যার মোহন আবরণে।
চির-চেনা পৃথিবীর যত কথা, যত হাসি গান
ইচ্ছা করে—প্রাণভরে আবার আকণ্ঠ করি পান ;
অমৃত-গরলে-মেশা অভিনব সে মহাজীবন
আবার নতুন করে একবার করি আস্বাদন।
জীবনের গল্পলোকে আজকে সে নয় বরণীয়া ;
না হোক—তবু সে থাক কল্পলোকে চিরস্মরণীয়া :

শারদীয় কথাসাহিত্য, ১৩৬৭

সুষুপ্তির কোলে

তন্দ্রা নয়, নিদ্রা দাও,—
নিদ্রা দাও সুষুপ্তি-গভীর।
তবু কিছুক্ষণ
দুশ্চিন্তার দাহ থেকে পাই পরিত্রাণ।
আতঙ্কে আক্রোশে ক্ষুব্ধ ঊর্ধ্বে মহাকাশ,
নিম্নে দুর্বিষহ ক্ষোভে সমুদ্র উত্তাল।
তন্দ্রা নয়, নিদ্রা দাও,—
নিদ্রা দাও সুষুপ্তি-গভীর।
পীড়িত চেতনা আজ দুঃস্বপ্নে পাণ্ডুর,
কবন্ধেরা ছায়া ফেলে অর্ধ-জাগরণে।
মানুষ মমতাহীন, দেবতা বধির,
বঞ্চিতের বোবা কান্না বিষায় বাতাস।
লোভার্তের বহ্নিবাণ বিদ্ধ করে ক্ষোভার্তের প্রাণ,
মসীকৃষ্ণ অন্ধকারে কে জাগাবে আলোর আশ্বাস ?

ঘুচে গেছে ব্যবধান দ্বিপদে শ্বাপদে।
হিংস্রতার প্রতিযোগিতায়
উভয়েই খড়্গপাণি—কে কাকে হারায়।
কথা আজ কথা নয়, শুধু বাচালতা,
একান্ত সংশয়গর্ভ সমস্ত শপথ।
সুজনের ভাব নেই, আছে শুধু সৌজন্য যান্ত্রিক,
প্রশংসার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপ।

সংসারের রথচক্র স্বার্থের সরণি বেয়ে চলে
কে তাতে দলিত হলো কে রাখে সে খোঁজ ?
সমাজে মানুষ নেই, আছে শুধু দল আর শ্রেণী,
প্রাণ নেই, গান নেই, আছে শুধু সোচ্চার শ্লোগান।
অসহ এ পরিবেশ অহরহ আজ
গোপনে শোষণ করে তিলে তিলে তাজা প্রাণরস।
জাগর চেতনা তাই বিশ্রামের অবকাশ খোঁজে
দুরন্ত দুশ্চিন্তাহর সুষুপ্তির কোলে।

বঙ্গবাসী মর্ণিং কলেজ পত্রিকা, ১৩৬৭

কে কাকে ?

কে কার শুশ্রূষা করে ?
জ্বর আর বিকারের ঘোরে
ঘরে ঘরে শান্তিপ্রিয় সমস্ত মানুষ
আজকে বেহুঁস।
পারা বেয়ে উর্ধ্বে ওঠে যত দেহতাপ
কণ্ঠে জাগে বিকারের অবুঝ প্রলাপ।

সান্ত্বনা কে দেবে কাকে ?
একই জবাব আসে প্রশ্ন করি যাকে।
সকলেরি চোখে জল,
প্রত্যেকেই কম বেশী নৈরাশ্যে বিহ্বল।
চেয়ে চেয়ে না-পাওয়ার নৈরাশ্য বেদনা
আচ্ছন্ন করেছে যেন প্রত্যেকের জাগ্রত চেতনা।

কে কাকে ধিক্কার দেবে আজ ?
অপরাধবোধে ত্রস্ত সমগ্র সমাজ।
মুখে মুখে বড়ো কথা যে যা'ই বলুক,
মনে মনে সকলেই যেন কোনো কিছুর ভিক্ষুক।
বহিরঙ্গ সৌজন্যের তলে
ঈর্ষা ও বিদ্বেষ-বহ্নি ধিকি ধিকি জ্বলে।

শারদীয়া 'জয়শ্রী,' ১৩৬৭

নানা রূপ, নানা নাম

একই নদী
নানা রূপ, নানা নাম, বিচিত্র বাহিনী।
দুরন্ত তরঙ্গভঙ্গে কোথাও সে একান্ত মুখরা,
নিস্তরঙ্গ নীরবতায়ে কোথাও সে মৃদুকলস্বরা।
কোথাও সে ভাগিরথী—সঞ্জীবনী পূত স্পর্শে তার
প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে মৃত সুপ্ত সগর রাজার।
কোথাও বিস্রস্তবেণী রূপসী—কাবেরী তার নাম,
উপল বন্ধুর পথে গতি তার উধাও উদ্দাম।

একই নদী—
নানা রূপ, নানা নাম, বিচিত্রবাহিনী।
বিন্ধ্যপাদে শীর্ণ রেবা—দর্শনে সে সদ্য পুণ্যপ্রদা,
আবার সে লীলাময়ী, নামান্তরে নায়িকা নর্মদা।
কোথাও সে ভাবময়ী ধ্যানমগ্না বিদুষী বিপাশা,
দু'চোখে জিজ্ঞাসা আর কণ্ঠে চির অতৃপ্ত পিপাসা।
কখনো সে বেগবতী—স্রোতে তার ভাঙনের নেশা,
আবর্তিত ঘূর্ণিপাকে, স্পর্শে তার সর্বনাশ মেশা।
কোথাও সে স্বচ্ছতোয়া শুভ্রকায়া নদী সরস্বতী,
পাদপদ্মে নিবেদিত বিমুগ্ধের আভূমি প্রণতি।
যাত্রা যার অভিসারে পারাবারে হতে আত্মহারা,
হয়তো সে পথ ভুলে সাহারায় হয় লুপ্তধারা।
একই নদী—
নানা রূপ, নানা নাম, বিচিত্রবাহিনী।
একই নারী—
নানা রূপ, নানা নাম, বিচিত্র কাহিনী।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

ওদের বোলোনা কিছু

ওদের বোলো না কিছু ;
রিক্ত ওরা, দিশাহারা, ওরা অসহায়।
ওদের চলার পথ আস্তীর্ণ কঙ্করে,
দু'পাশে কণ্টকবন, সম্মুখে নিরন্ধ্র অন্ধকার।
তাই ওরা অসহিষ্ণু, কণ্ঠস্বরে বিক্ষোভের সুর।
মিষ্ট হাসি, শিষ্ট কথা, বিনীত জিজ্ঞাসা
আজকে ওদের কাছে দাবী করা বৃথা।

কী দেখেছে, কী পেয়েছে ওরা ?
ওরা যে দেখেছে নিত্য মহত্বের গ্লানি, অপমান,
আদর্শের অপমৃত্যু, অযোগ্যের মূর্খ আস্ফালন,
দলাদলি, হানাহানি লোভে আর ক্ষোভে,
ভগবান রুদ্ধকণ্ঠ শয়তানের সতীনের ভয়ে।
ওরা যে দেখেছে
'সত্যমেব জয়তে'র দিন অবসান,
'যথা ধর্ম তথা জয়'—অক্ষমের ইষ্টমন্ত্র শুধু,
সাধুতা এ যুগধর্মে ভীরুতার নব নামান্তর,
জারজ অর্থের পিতা সমাজের বিবেকরক্ষক।
ওরা তো দেখে নি ধন্য মহাজীবনের পুণ্যছবি
ত্যাগে প্রেমে সত্যে কর্মে মহীয়ান সেবায় ক্ষমায়
ওরা যে পায়নি কিছু অপমান অনাদর ছাড়া,
ঘরে পরে উপেক্ষিত, অবজ্ঞাত ওদের জীবন,

রুদ্ধ দ্বারে মাথা কুটে ফিরে আসে ওরা ;
দু'চোখে ঘনিয়ে আসে নৈরাশ্যের গাঢ় অন্ধকার।
মমতার স্পর্শ যারা পায়নি জীবনে,
ক্ষমতার রক্তচক্ষু দেখে দেখে শিশু মনে প্রাণে,
ঘৃণা নয়, অবহেলা অনাদর নয়···
সমাজের কাছে ওরা দাবী করে আরেকটু মমতা

শারদীয়া 'জয়শ্রী,' ১৩৬৭

চেতনার অবক্ষয়

বিষণ্ণ সংশয়
আর নয়।
আমাকে প্রাণিত করো প্রসন্ন প্রত্যয়ে।
প্রতিপদে দুর্ভাবনা, প্রতিকাজে কণ্টকিত ভয়ে,
অহরহ মনে দ্বন্দ্ব—হবে কি হবে না
ভালো-মন্দ ভেবে ভেবে সন্দেহ কাটে না,
চেতনার এই অবক্ষয়
আর নয়।

আমাকে প্রতিষ্ঠ করো সে আত্মপ্রত্যয়ে
যে-প্রত্যয় অকম্পিত স্তুতি-নিন্দা, জয়-পরাজয়ে,
তুচ্ছ করে ক্ষয়-ক্ষতি, দ্বিধা করে জয়,
সঙ্কল্পে দুর্বার আর সংগ্রামে নির্ভয়।
সে-প্রত্যয় খুঁজে ফিরি আমি
যার চোখে এ জীবন মৃত্যুপারগামী;
যে-প্রত্যয়ে মৃত্যু নয়—জীবনের শেষ পরিণতি,
অনন্ত চলার পথে সাময়িক চলার বিরতি।
সংশয়ের অন্ধকারে যে-জীবন সদা-সঙ্কুচিত,
প্রত্যয়ের সূর্যালোকে হোক্ সে সহজে প্রসারিত।

শারদীয় 'কথাসাহিত্য', ১৩৬৭

৯

পলাতক

এখনো কবিতা লেখে আমার লেখনী
লোকে তাই আমাকেই ভাবে কবি বলে।
অথচ সে কত মিথ্যা আমি তো তা জানি।
একজন কবি ছিল —মিতবাক্, স্মিতহাস্যমুখ,
আকাশের নীল স্বপ্ন দু'চোখে জড়ানো,
অন্তরে অনন্ত ঊর্মি সাগর-সম্ভবা
সৈকত-সংঘাতে নিত্য মুখর, উত্তাল।
আমি ছাড়া কেউ তার পায়নি সাক্ষাৎ।
সে আমার মুক্ত অবসরে
এসেছে নিরালা ঘরে দ্বার খুলে মৃদু করাঘাতে
অতর্কিত আবির্ভাবে তার
মূক লেখনীর মুখ হয়েছে মুখর।
আসংজ্ঞান অন্তরের তার যত কথা
আমার লেখনীমুখে হয়েছে কবিতা।
আমি সেই সৃষ্টি-লীলা দূর থেকে করেছি দর্শন।

আজ সে নিরালা ঘরে অবাঞ্ছিত মানুষের ভিড়,
কর্মহীন কোলাহলে ত্রস্ত অবসর ;
সে লেখনী আজো আছে, কবি পলাতক ;
নেই তার উপস্থিতি, পড়ে আছে কিছু তার স্মৃতি।
লেখনী কবিতা লেখে সে স্মৃতি-মন্থনে,
আমি শুধু দ্রষ্টা তার—স্রষ্টা সেই পলাতক কবি।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা, ১৩৬৭

একই মাটি সুজলা সুফলা

পুবের পোতার ঘরে তুমি করো বাস,
এখন আমার বাস পশ্চিম পোতায়,
দু'ঘরের মাঝখানে মোতায়েন সশস্ত্র প্রহরী।
দু'দণ্ড আলাপ করি—আজন্মের সেই অধিকারে
চিরতরে বঞ্চিত দু'জনে।
অথচ জানে না ওরা আমাদের স্নায়ুতে শিরায়
চেতনার ফল্গুধারা একই রূপে আজো বহমান ;
তোমার আমার কণ্ঠে একই কথা, একই গান বাজে
তোমার আমার বুকে উদ্বেলিত একই ভালোবাসা।
তোমার আমার চোখে একই স্বপ্ন কাঁপে থরোথরো,
একই বসন্তের পিক দু'জনের কুঞ্জবনে ডাকে।
একই ফসলের খেলা দু'জনের ক্ষেতে,
একই ফুল নিত্য ফোটে দু'ঘরের খোলা আঙিনায়,
এক চন্দ্র, একই সূর্য, উর্ধ্বে এক উদার আকাশ,
দু'য়েরি পায়ের নীচে একই মাটি সুজলা সুফলা।
দু'জনের আঙিনায় একই ঋতু করে আনাগোনা,
তোমার পদ্মার ঢেউ আমার গঙ্গার বুকে লাগে।
একই ঘর সংসারের মানুষ দু'জন,
অথচ আমরা নাকি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশবাসী।

সংহতি,-আষাঢ় ১৩৬৭

অভ্যর্থনা

আবার এসেছ ফিরে ?
এলে যদি যেয়োনা এখুনি,
কল্পনার স্বর্গ হতে
কী বার্তা এনেছ, বলো শুনি
কলকণ্ঠে সেই স্বর,
ওষ্ঠপুটে সে-হাসি অম্লান ;
দু'চোখে সে দীপশিখা
আশ্চর্য, এখনো অনির্বাণ।

মধ্যদিন অতিক্রান্ত,
অপরাহ্ণ আসন্ন এখন,
আর কিছুক্ষণ পরে
দিগন্তে দিনান্ত আয়োজন।
আকাশ আবেশহীন,
তপন ক্রমশঃ নিরুত্তাপ,
উদাসী হাওয়ার কণ্ঠে
বৈরাগ্যের গৈরিক সংলাপ।
সেতারে ওঠেনা আর
আগেকার ললিত ঝঙ্কার,
গীতরিক্ত মরুপথে
আজ শুধু একতারা সার।
সেবার যখন এলে
তখন হয়নি অসময়,

প্রত্যয়ে প্রতিষ্ঠ মন—
আরণ্যক সঙ্কল্পে দুর্জয়।
কী চেয়েছি, কী পেয়েছি,
কী দিয়েছি—রাখিনি হিসাব,
আনন্দে করেছি ধ্যান
তোমার আরাধ্য আবির্ভাব।
সে-কথা তুমি-ই জানো
আজ কেন এলে অকস্মাৎ,
চির-বিদায়ের আগে
হয়তো এ সৌজন্য-সাক্ষাৎ।
আজ কিছু চাওয়া নয়,
অবাক্ বিস্ময়ে চেয়ে-থাকা,
কোন কিছু বলা নয়,
শুধু শোনা, শুনে মনে-রাখা
এসেছ যখন, জেনো—
উপেক্ষায় দূরে ফিরাবো না,
অবেলার অর্ঘ্য দিয়ে
জানাবো অন্তিম অভ্যর্থনা।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

জরতী পৃথিবী

জরতী পৃথিবী ধুঁকছে,
যাতনায় দিন গুনছে,
স্থবিরের মতো কান পেতে সব শুনছে,
চোখ মেলে সব দেখছে—
সভ্যতা আজ কোন্‌খানে গিয়ে ঠেকছে।
মনে মনে আজ কেউ কারো ভালো চায় না,
গান-ভরা বুলি শুধু বাচালতা, নিজের ভালোর বায়না।
লোভে আর ক্ষোভে মেতেছে আহবে, প্রাণে আর মানে দ্বন্দ্ব,
বাতাসে ভাসছে তাজা বারুদের গন্ধ।
মহাশক্তির নামাবলী গায়ে তাকায় করাল ধ্বংস,
জরতী পৃথিবী দেখে দেখে তার হচ্ছে বুদ্ধি ভ্রংশ,
কুটিল ক্লৈব কামনার ভয়ে ত্রস্ত ভাবনা শৈব,
শয়তান হাসে, ভগবান কাঁদে এ কেমন দুর্দৈব!
বেদনায় আর যাতনায় তাই জরতী পৃথিবী ধুঁকছে,
ভালোকে সবাই ছলে বলে আজ প্রাণপণ করে রুখছে।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা, ১৩৬৭

সমুদ্র-সাধ

প্রচ্ছন্ন আভাস নয়,—প্রসন্ন আশ্বাস
যদি তুমি রেখে যেতে নীরবে সেদিন,
আমার সমুদ্র-সাধ হয়তো তা'হলে
স্বপ্নের-আকাশ থেকে নীচে নেমে এসে
একদা সার্থক হতো তটের মৃত্তিকা-লগ্ন হয়ে।
অর্ধ-স্মৃত প্রহরেরা মাঝে মাঝে প্রেতমূর্তি ধরে
যখন জাগর-স্বপ্নে হানা দিয়ে যায়,
বেশ পড়ে মনে
সংশয়ে বিস্ময়ে মেশা তোমার সমগ্র আচরণ
প্রাণের প্রত্যয়-ভূমি মাঝে মাঝে ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে।
পেয়েছি আশ্রয় যবে, চেয়েছি প্রশ্রয়,
হয়তো পেয়েছি তা'ও, তবু মনে ঘোচেনি সংশয়।
প্রসন্ন আশ্বাসে নয়, প্রচ্ছন্ন আভাসে
চাক্ষুষ মুহূর্তগুলি করেছ চঞ্চল,
বর্তমান কাঁপে তাই অতীতের ঝোড়ো হাওয়া লেগে,
প্রশ্রয়ের স্মৃতিটাকে সংশয়ের আবরণে ঢাকি।

শারদীয় 'সমাবেশ', ১৩৬৭

আমার ঈশ্বর

অযথা খুঁজেছি তাঁকে মঠে ও মন্দিরে
অথবা শূন্যের স্বর্গে কিংবা তীর্থভূমে।
আমার ঈশ্বর
জীবনের নানা পর্বে নানা মূর্তি ধরে
আধার-আধেয়রূপে বিচিত্র রসের
দিয়েছেন বারংবার বাঞ্ছিত দর্শন।
এসেছেন বাল্যে ও কৈশোরে
জনক-জননীরূপে বাৎসল্যের প্রমূর্ত আধার,
হাত ভরে সেবা দিতে প্রতিদানহীন।
তারপর এসেছেন জয়িষ্ণু যৌবনে
জায়ারূপে,—একাধারে মধুরের আধেয়-আধার,
সেবা দিতে সেবা নিতে ভরে দেহ মন।
সার্থক হয়েছে সেবা পরস্পর দানে ও গ্রহণে।
তারপর এসেছেন ক্ষয়িষ্ণু যৌবনে
পুত্ররূপে কন্যারূপে,—বাৎসল্যের প্রমূর্ত আধেয়,
সেবা-অর্ঘ্য কেড়ে নিতে মুখে হাসি, চোখে জল নিয়ে,
উৎসুক হয়েছি আজ ফিরে দিতে পেয়েছি যা' কিছু।

শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৬৭

দমকা হাওয়া

দখিন-কোণের ভেজানো জানলা আচমকা গেল খুলে :
ঘরের ভিতরে দমকা হাওয়ার দুরন্ত দাপাদাপি।
উড়ে যায় সব, খসে পড়ে সব, সারা ঘর তচনচ,
অথচ এখন কালবৈশাখী নয়।
ফাল্গুন গেছে কিন্তু এখনো চৈত্রের কিছু বাকি,
কখনো কখনো কোকিলের ডাক দূর থেকে ভেসে আসে।
খেয়ালী আকাশ অকালে পাঠালো এ কোন্ পাগলা হাওয়া,
বহু যত্নের সাজানো গোছানো ঘর সামলানো দায়।

উড়ে যায় ঐ টব থেকে যত কাগজের ফুলগুলো,
কাঁচের পেয়ালা পড়ে ভেঙে খানখান।
কোন্‌টাকে ধরি, কোনটাকে ছাড়ি, বিষম কাণ্ডখানা,
সামলাতে গেলে একটা, ওদিকে আরেকটা বেসামাল।
রঙিন ফ্রেমের আধারে বাঁধানো দেয়ালে-টাঙানো সেই
কত আদরের আলোকচিত্রখানি,
শেষকালে সেটা সশব্দে গেল পড়ে।
সব ছেড়ে দিয়ে ছুটে গিয়ে তাকে দু'হাত বাড়িয়ে তুলি,
চেয়ে দেখি তার কাঁচখানি গেছে ভেঙে,
একখানি মুখ আল্‌গা ধুলোয় ঈষৎ ঝাপসা যেন।

'কবি ও কবিতা', মহালয়া, ১৩৬৭

আর এক দেবতা

আর এক দেবতা আছে— খেয়ালী দেবতা,
স্বর্গ নয়, মর্ত্য তার প্রিয় লীলাভূমি ;
মানুষের কামনায় উদয় বিলয়ে
নিত্য তার আবির্ভাব, নিত্য অন্তর্ধান।
প্রাচীন পুরাণে শাস্ত্রে তার নাম অনুক্ত এখনো,
ভক্তের তৃষিত চোখে রূপ তার আজো অরচিত।
সে শুধু দেবতা নয়, দ্বিতীয় বিধাতা,
অঘটন ঘটায় সে অহরহ মনের জগতে।
অন্য দেবতার মতো নেই তার বাঁধা বিধি কোনো,
অথচ বিধান তার অলঙ্ঘ্য, অমোঘ।
খেয়ালী সে—লীলা তার বোধের অতীত,
তবু তার অনুগত মনোময় যে কোনো মানুষ।
সমস্ত চেতনা চিন্তা প্রতিহত করে
আশার অলীক স্বর্গে কখনো সে নিয়ে যায় টেনে।
আশ্বাসে উজ্জ্বল করে কিছুক্ষণ সেই রঙ্গভূমি,
অতর্কিতে নতুন খেয়ালে
ভেঙে ফেলে সেই স্বর্গ, স্ব-রচিত সেই স্বপ্নপুরী
নির্বাধে নিক্ষেপ করে নৈরাশ্যের অতল নরকে।
হতাশার অন্ধকারে আবার কখনো
আশার দীপালি জ্বেলে অতি সন্তর্পণে
কামনাকে ধীরে ধীরে করে কমনীয়।
সর্বদেশে সর্বকালে সে দেবতা অনন্য একক ;
মনোময় মানুষের মানস-পুরাণে
তার নাম বহুশ্রুত ; সে হলো—'কল্পনা'।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

আমরা

আমরা চীৎকার করি 'গেল গেল' বলে,
ঋতু-বদলের পালা শুরু হলে জগতে জীবনে।
হারানোর কল্পনায় পাওয়ার বাস্তব যাই ভুলে,
নিন্দায় নিজিত করি ছন্দবেশী যুগ-দেবতাকে।
ইচ্ছা করে—সময়ের ঘড়ির কাঁটাটি
অলক্ষ্যে ঘুরিয়ে দিই আবার বাঁ দিকে;
অথবা প্রস্থান করি প্রেতলোকে মর্ত্যলোক থেকে
হাওয়া-বদলের হাওয়া সযত্নে এড়াতে।
নির্বিকার মহাকাল অগ্রগামী পদক্ষেপে চলে,
নিঃশব্দে অদূরে বসে ইতিহাস মৃদুমন্দ হাসে।

'কবি ও কবিতা', মহালয়া, ১৩৬৭

'তবু—'

সব দ্বার রুদ্ধ হয় এমনি সহসা।
সব গান থেমে যায়,
সব স্বপ্ন ভেঙে যায়,
সব আলো নিভে যায় একদা নিমেষে।

তবু ঘুরি দ্বার থেকে দ্বারে,
নতুন গানের তৃষা জেগে ওঠে প্রাণের নিভৃতে,
সত্য ছেড়ে স্বপ্ন খুঁজি পাগলের মতো,
নিভে যায় —বারংবার অন্ধকারে তবু জ্বালি আলো
যা' কিছু হারিয়ে যায় ফের খুঁজি তাই—
যা খুঁজি তা এ জীবনে পাই বা না পাই।

শারদীয় কথাসাহিত্য, ১৩৬৭

অপূর্ণ ইচ্ছার বোঝা

অপূর্ণ ইচ্ছার বোঝা বয়ে বয়ে বয়ে
গোরুর গাড়ির মতো চলেছে জীবন
অর্ধ-ভুক্ত কামনার বলদের পরে ভর দিয়ে
নিরুপায় নির্ভরতা নিয়ে।
দিনের আলোক-ভীরু প্রেতের মতন
মাঝে মাঝে সে-ইচ্ছারা
জেগে জেগে নড়ে নড়ে উঠে
যখন সম্মুখ পথে ফেলে কালোছায়া,
পথ আর বিপথের ব্যবধানটুকু
অতর্কিতে মুছে যায়।
অব্যক্ত কী বেদনায়
জীবন-যানের কায়া কেঁপে কেঁপে ওঠে,
চলন্ত চাকার গতি স্তব্ধ হয়ে আসে।

তারপর ঝঞ্ঝা নামে সঙ্গে নিয়ে স্মৃতির বিদ্যুৎ,
দ্বন্দ্ব চলে মাটিতে আকাশে।
তারপর কিছুক্ষণ পরে
অপূর্ণ ইচ্ছার বোঝা বয়ে বয়ে বয়ে
আবার এগিয়ে চলে অতৃপ্ত জীবন।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা ১৩৬৭

নামহীন গ্রহ

অনেক জগৎ আছে এই জগতের অভ্যন্তরে—
ধরিত্রী-গ্রহের গর্ভে নামহীন গ্রহ উপগ্রহ।
দেবতার সৃষ্টি নয়, সৃষ্টি তারা মর্ত্য মানুষের,
নির্ধারিত কক্ষে তারা চিরকাল একভাবে স্থির।
সে গ্রহ-জগৎগুলি সুরক্ষিত নগরীর মতো
সুরভিত সুসজ্জিত আমাদেরি বাসনা-প্রসূনে।
বিশ্বামিত্রের মতো সৃষ্টি করে যে যার জগৎ
অনধীন আধিপত্যে বাস করি আমরা সেখানে।

জগতে জগতে তাই এমন দুস্তর ব্যবধান,
কলহ-সংগ্রাম-দ্বন্দ্ব অহরহ মানুষে মানুষে ;
একান্ত কাছের জন মনে হয় দূরের মানুষ,
ভাবনা ও কল্পনায় দু'জনের আশ্চর্য অমিল।
একের মুখের হাসি অন্যের চোখের জলে ভেজা,
একের উৎসব-রাত্রে অন্যের বিষণ্ণ জাগরণ ;
কেউ নয় অন্য কারো জীবনের সহজ শরিক,
প্রত্যেকে স্ব-গ্রহে বন্দী স্বেচ্ছা-সৃষ্ট কামনার জালে।

মাসিক বসুমতী, অগ্রহায়ণ, ১৩৬৭

মৃত-পলাতকা

চার দেয়ালের মাঝে বন্দী হয়ে বসে আছি একা,
ফাঁকা ঘর খাঁ খাঁ করে—ওরা কেউ নেই।
ঘড়ির টিক্‌টিক্ আর টিকটিকির ডাকে
শিহরিত চৌদিকের স্তম্ভিত স্তব্ধতা।
ডেকে উঠি একে একে নাম ধরে—মেলে না উত্তর,
নৈঃশব্দ্য বিদীর্ণ করে ফিরে আসে নিজ কণ্ঠস্বর
দেয়ালে আহত হয়ে। ভুলে যাই সব,
শূন্য অঙ্কে নেমে আসে সমস্ত চেতনা।

তন্দ্রা আসে, ভেঙে যায়। চিন্তাতপ্ত চোখের সম্মুখে
ছায়া-মূর্তি ভেসে ওঠে—চেনা-চেনা মুখ,
সোল্লাসে চীৎকার করে বলে উঠি—আয়, আয়, আয়,
হো-হো করে হেসে উঠে সে মূর্তিরা পলকে মিলায়।
ভুল ভাঙে, মনে পড়ে—মিছে আর নাম ধরে ডাকা,
আনন্দ মরেছে আর তার শোকে হাসি পলাতকা।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

আরো ভালোবাসা

কথার উপরে কথা সাজিয়ে সাজিয়ে
কত কবি রচেছেন বাণীর প্রাসাদ।
তরঙ্গিণী ভাবের তটিনী
বয়ে গেছে তার প্রান্তে কলুকলু স্বরে,
দিব্য কম-কল্পনার ছায়াবীথি তাকে
সোহাগে রেখেছে ঘিরে।
নানা দিক্‌দেশ থেকে অগণ্য পথিক—
কখনো সঙ্কটে ক্ষুব্ধ, সংশয়ে জর্জর
এসেছে সে তীর্থধামে দলে দলে দোলাচল মনে,
প্রত্যয়ের স্পর্শ পেয়ে ফিরে গেছে ঘরে।
আবার এসেছে কেউ সুন্দরের স্বপ্ন নিয়ে চোখে,
বুকে নিয়ে অনন্তের তৃষা,
নিশ্চিন্তে যাপন করে বিমুগ্ধ প্রহর,
কী পাওয়ার মহাখুশী মনে নিয়ে ফিরে গেছে তারা।

আজ সে প্রাসাদ যেন পরিত্যক্ত জীর্ণ দেবালয়—
ভক্ত আর ভগবানে সংশয়ের লুকোচুরি খেলা ;
শাশ্বত কথার ভিত ধ্বসে পড়ে মৌন উপেক্ষায়,
সেখানে নতুন করে আমি আর কী সাজাবো কথা।
সে এক কবির কথা মনে পড়ে—ঋষিকল্প কবি,
একদা ধ্বনিত হলো যার কণ্ঠে—আলো, আরো আলো।
আমার এ ক্ষীণ কণ্ঠ সে কবি-কণ্ঠের সুরে মিশে
বলে যাক্ চুপি চুপি—ভালোবাসা, আরো ভালোবাসা।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা ১৩৬৭

আকাশে-দর্পণে

আকাশে অনেক তারা—নিষ্প্রভ, উজ্জ্বল,
দর্পণে অনেক মুখ—স্মৃত ও বিস্মৃত।
যে অশেষ বিস্ময়ের অব্যক্ত আবেশে
তারার দু'চোখ কাঁপে পৃথিবীর মুখপানে চেয়ে,
যেন তারি' রেশ
দর্পণে বিস্মিত মুখে অতীতের স্বপ্ন নিয়ে ভাসে।
সুদূরের তারা আর মুকুরের মুখে কত মিল।

নদীতে অনেক জল—আবিল, নির্মল,
হৃদয়ে অনেক ভাব—নিস্পন্দ, চঞ্চল।
যেমন নদীর জল কখনো আবিল
উত্তাল তরঙ্গাঘাতে হারায় কিনারা,
আবার কখনো নীল, প্রশান্ত মন্থর,
হৃদয়ের ভাব যত আশ্চর্য! অমনি
প্রকাশের অন্ধবেগে অন্ধ দিশাহারা,
আবার কখনো তারা স্বভাবে সংযত।
নদীর নীরের সাথে হৃদ্‌গত ভাবের আত্মীয়তা।

শারদীয় দৈনিক বসুমতী, ১৩৬৭

কাল রাতে

কাল রাতে বৃষ্টি হলো মিষ্টি মধুর—
প্রথমে অঝোর ধারে, তারপর টিপ টিপ টিপ।
অভাবিত বর্ষণের স্নিগ্ধ ধারাস্নানে
তৃষাতুরা বসুধার তপ্ত তনুমন
তৃপ্ত হলো পুলকান্ত তন্দ্রার আবেশে।
ভরে গিয়ে নদী-নালা, ভিজে গেল তীরাশ্রিত মাটি।
রাত ভরে বৃষ্টি হলো, তারপর ভোরে
নির্মেঘ নির্মল নীল প্রশান্ত আকাশে
সহসা ছড়িয়ে গেল সোনালী আভায়
বীতনিদ্র বসুধার খুশি-ভরা হাসি।

'কবি ও কবিতা', মহালয়া, ১৩৬৭

প্রত্নরূপ

দু'পাশে দালান বাড়ি, মাঝখানে এক ফালি জমি-
আগে ছিল শিশুদের খেলবার মাঠ,
ঘাসে আর আগাছায় ভরা ; এখন সে জলময়।
ছিপ নিয়ে মাছ ধরে পাড়ার ছেলেরা।
শ্রাবণের অশ্রান্ত বর্ষণ
স্থলের মহিমা তার করেছে হরণ।
এখন সে মাঠ নয় -জলচর প্রাণী-লতা তৃণে
সুশোভিত জলাশয়।
ছোট ছোট ঢেউগুলি হেলে দুলে নিয়ে যায় বয়ে
জলের অস্থির বার্তা চিরস্থাণু স্থলের কিনারে।
মাঝে মাঝে নাল গাছ ফুল পাতা মেলে
ঢেকেছে উপরিতল, তার নীচে জলের ভিতরে
ছোট-ছোট মাছ আর শামুক শিশুরা
লুকোচুরি খেলা করে পরম আরামে,
মানব শিশুর দল একদা যেমন
আনন্দে করেছে খেলা দু'বেলা ওখানে।
সৃষ্টির সুদূর স্মৃতি জাগরূক করে
কোথা থেকে এলো ওরা কেউ তা জানে না।

দু'পাশে দালান বাড়ি, দুই ধারে বাঁধানো সড়ক,
তার মাঝে চার কাঠা এক ফালি জমি—জলময়।
সভ্যতাকে ব্যঙ্গ করে নির্বাক ভাষায়
প্রকৃতি ধরেছে যেন সেই প্রত্নরূপ—
যখন জাগেনি স্থল, আসেনি মানুষ,
সৃষ্টি ছিল জলময়,—বিবর্তের আবর্তে চঞ্চল
বিচিত্র সম্ভার নিয়ে অপূর্ণ প্রাণের।
সে কোন্ কালের কথা—স্মরণের একান্ত অতীত,
অথচ কি যাদুমন্ত্রে সে দৃশ্য সহজে কায়াময়!

শারদীয় কথাসাহিত্য, ১৩৬৭

কুম্ভকর্ণ

ভেঙেছে নিদ্রার ঘোর, কুম্ভকর্ণ সহসা জাগ্রত,
দুরন্ত দাপটে তার কম্পিত মেদিনী ;
সঘন নিশ্বাস তার প্রলয়ের ঝঞ্ঝা-মূর্তি ধরে
সন্ত্রাস সঞ্চার করে সর্বজন-মনে।
ধ্বসে পড়ে ঘর বাড়ি, গিরিশৃঙ্গ আতঙ্কে অস্থির,
প্রাচীন অক্ষয়বট উন্মূলন-ভীত ;
কথা চুপ,-- কানাকানি, চোখে চোখে নিঃশব্দ ইসারা,
দিশাহারা নরনারী আতঙ্কে পাণ্ডুর।
সুপ্তিমগ্ন কুম্ভকর্ণ রোষানলে আরক্ত দু'চোখ
দাম্ভিকের দর্পচূর্ণ করে সে নিমেষে,
মহাকাল যে-জঞ্জাল কালে কালে করেছে পুঞ্জিত
সরাবে সে, কণ্ঠে তার দুর্দম শপথ।
বীতনিদ্র কুম্ভকর্ণ মত্ত ঋত পথের সন্ধানে,
জানি না এ নিদ্রাভঙ্গ কালে কি অকালে।

শারদীয়া 'জয়শ্রী', ১৩৬৭

সেই চাঁপা গাছ

স্বহস্তে রোপিত নয়,
সরকারী বেতনভোগী কোনো এক কর্মচারী কার
উপরওলার কোনো লিখিত হুকুমে
বাড়ির সামনের পাকা সড়কের পাশে
একদা লাগিয়েছিল চারা চাঁপা গাছ।
কেটে গেছে তার পরে পাঁচ ছ' বছর।
রোদে জলে বেড়েছে সে ;
মাটির মমতা আর আকাশের উদাসীন স্নেহে
নিষ্পাপ অরণ্য-শিশু শৈশব কৈশোর পার হয়ে
দিয়েছিল সবে পা যৌবনে
কচি কাঁচা পাতা-ঘেরা দু'টি ডালে তার
ধরেছিল ছোট দু'টি কলি,
অচিরে কনক কান্তি কুসুম-সম্ভারে
প্রাণের ফুটন্ত খুশি প্রকাশের নিশ্চিত আভাস।

মনে পড়ে কতদিন চৈত্রে ও বৈশাখে
আকাশ বর্ষণহীন, তার ফলে রিক্তা বসুন্ধরা
পারেনি জোগাতে ওকে প্রাত্যহিক স্নেহরসসুধা
তখন দু'বেলা নিজে জলসেক করে
সযত্নে দিয়েছি ভরে ওর আলবাল ;
রিক্ত শাখা ভরে গেছে নব কিশলয়ে।

কেটে গেছে এইভাবে পাঁচ ছ' বছর ;
তারপর কী যে ঘটে গেল—
সহসা আকাশ ভেঙে বর্ষা এলো ভাদ্দরের শেষে,
প্লাবনের রূপ নিল আকাশের অঝোর বর্ষণ
ভেসে গেল পথ ঘাট, ঘরের উঠোন,
কোমর সমান জলে মগ্ন হলো সেই চাঁপা গাছ।
দশ রাত দশ দিন গেল পার হয়ে,
তারপর জল সরে দেখা দিল মাটি ;
তখন সমস্ত শেষ।
অভাবের অভিশাপে মরে নি যে, আজ
অযাচিত প্রাচুর্যের অতর্কিত চাপে
দেহে মনে ধীরে ধীরে গেল সে শুকিয়ে।

শারদীয় যুগান্তর, ১৩৬৭

ভৌগোলিক সীমা

শূন্যে মৌনী নীলাকাশ উদার উদাস,
নীচে মাটি সর্বংসহা দিগন্ত-আয়ত
আমাদের ভূস্বর্গ পৃথিবী,
স্থলচর প্রাণীদের অবারিত বিচরণভূমি।
কখনো বাহুর বলে কখনো বুদ্ধির
আমরা সাবিক ভূমি নিজেদের অধিকারে এনে
বাস্তু গড়ে তুলি, গড়ি গঞ্জ-গ্রাম, শহর-নগর,
প্রহরার বেড়া-ঘেরা দেশ মহাদেশ।
ধর্ম বর্ণ ভাষা আর সংস্কৃতির ভেদ ভিত্তি করে
সযত্নে রচনা করে জাতি-অভিমান
আমরা নিষিদ্ধ করি সাবিক ভূমিতে
সার্বভৌমত্তার নামে সকলের প্রবেশাধিকার।
সীমান্তে সীমিত হয় অসীম পৃথিবী।

কোথা থেকে হাওয়া আসে অকস্মাৎ দুর্দম দুর্বার
আবহাওয়া-জ্ঞানের দম্ভ পরাভূত করে;
সযত্নে যোজন করা বিধি-নিষেধের গ্রন্থিগুলি
সহসা শিথিল হয়, সীমান্তের বেড়াজাল টুটে
আবার গোচর হয় সীমাহীন বিশাল পৃথিবী।
যুগে যুগে দেখা যায় তাই—
দেশ ভাঙে, দেশ গড়ে, ঘুচে যায় ভৌগোলিক সীমা;
যুগে যুগে বারংবার দেখা যায় তাই—
বাস্তুকামী মানুষের বাস্তুহারা কান্নার মিছিল।

শারদীয় কথাসাহিত্য, ১৩৬৭

প্রীতিকণা

প্রীতিকণা—
ছোটকাল থেকে আমি চিনি জানি তাকে
আমি কেন, অনেকেই চেনেন প্রীতিকে।
স্বভাবে শরম-ভীরু, আলাপনে সুমিতভাষিণী,
মর্মতলে উচ্ছ্বসিত মমতার অমৃত-নির্ঝর;
চোখে তার দিব্য দ্যুতি, মুখে স্মিত হাসি,
সেবার নৈবেদ্য-ভরা আয়ত অঞ্জলি
প্রতিদান কামনায় কখনো যা' হয় না কুণ্ঠিত।

প্রীতিকণা—
প্রেয়সী না, শ্রেয়সী সে,—রূপে নয়, গুণে অতুলনা
মমতা করুণা দিয়ে বিধাতার আশ্চর্য রচনা।
একবার পেয়েছে যে অন্তরঙ্গ পরিচয় তার
সে কখনো ভুলবে না তাকে।
সে যেন পরশমণি—ক্ষণেকের জাদুস্পর্শে তার
জাতি-ধর্ম-মত-বর্ণ, সব ভেদ ঘুচে একাকার।
স্তুতি-নিন্দা, মান-অপমান
বিষামৃত তার কাছে সবই সমান।
ভীতির প্রহরা-ঘেরা কারা-গরাদের অন্ধকারে
সে প্রীতি মুমূর্ষু আজ; উদ্ধরণে তার
যে হবে অগ্রণী, তাকে করি নমস্কার।

শনিবারের চিঠি, পূজা-সংখ্যা ১৩৬৭

নতুন কিছুই নয়

কিছুই নতুন নয়—
না জীবন, না মরণ—সমস্তই পুরানো বিস্ময়।
বুক-ভরা প্রেম কিংবা মনে-প্রাণে ঘৃণা
কেউ নয় স্বভাবে নবীনা।
আগেও যেমন ছিল আছে তারা এখনো তেমনি—
একই রক্ত বহমান, নতুন ধমনী।
যুগে যুগে পুরাতন ফিরে ফিরে আসে
নূতনের মতো হয়ে ভিন্ন বেশ বাসে,
আমরা প্রাণিত হই নবীন উল্লাসে।
মনও নতুন নয়, দেহ আর মোহটা নূতন
সেই চির-চেনা চোখে মর্ত্যের স্বপন;
গতযুগের দেবতাকে যুগ-দেবতার সিংহাসনে
সানন্দে আসীন করে তবু ধন্য মানি মনে মনে!
ভিন্নভাবে কথা বলি, অন্য সুরে গেয়ে উঠি গান,
বিষামৃত পান করে প্রাণ কিন্তু চির আয়ুষ্মান।

প্রগতি, শারদ সঙ্কলন ১৩৬৭

জয় জয় জয় বাংলা দেশ

পূব দিগন্তে রক্ত-আখরে
নয়া ইতিহাস কে লেখে ঐ ?
সাড়ে সাত কোটি কণ্ঠ মুখর -
'জয় বাংলার জয়, মাভৈঃ'।
পদ্মা মেঘনা আড়িয়াল খাঁর
কল্লোলে সেই কণ্ঠরোল
মন্ত্রিত হয়ে নও জোয়ানের
বক্ষে জাগায় প্রলয় দোল।
নামী অদৃশ্য, জপনাম আছে—
মন্ত্রের মতো সঞ্জীবন,
শীর্ণ শিরায় শোণিত জোগায়,
জাগায় শোণিতে মুক্তিপণ।
একই কবরে সমাহিত করে
হিন্দুকে মুস্লিমের সাথ,
ধর্মধ্বজীর ঈর্ষা জাগিয়ে
জন্ম নিয়েছে বাঙালী জাত।
আহ্লাদে মেতে জল্লাদ দল
বর্ষণ করে বহ্নিবাণ,
গর্জনে তার ত্রস্ত গগন,
বারুদে বাতাস বেপথুমান।
শবে আকীর্ণ পথ প্রান্তর,
জঙ্গী জুলুম নির্বিচার,

তবু রব ওঠে 'বাংলার জয়',
        বাঙালীর ছেলে জানে না হায়।
ওরা যে করেছে আকণ্ঠ পান
        নব সৃষ্টির মাদক রস
মৃত্যুর ভয় যে করেছে জয়,
        কেমনে কে তাকে মানাবে বশ?
বীরের রক্ত, মায়ের অশ্রু
        ধরার ধূলায় হবে না শেষ;
'সোনার বাংলা', 'রূপসী বাংলা',
        জয় জয় জয় বাংলা দেশ।

শারদীয় জয়শ্রী, ১৩৬৭

ছবি শুধু ছবি

ছবি আর ছবি দেখি মনের পর্দায়
জন্মভূমির ছবি, স্বর্গের চেয়েও গরীয়সী।
চব্বিশ বছর আগে এক সে আশ্বিনে
যে-মাটি-মায়ের শেষ স্পর্শ শিরে নিয়ে
চলে আসি চুপি চুপি সীমান্তের বেড়া পার হয়ে
এ পারে নতুন বাসভূমির সন্ধানে,
তার আর্ত কণ্ঠস্বর ভেসে এসে পুবালি হাওয়ায়
জাগায় নির্বাক কান্না স্নায়ুতে আমার।
শিবিরে শরণ প্রার্থী অগণিত আতঙ্কিত মুখে
দেখি সেই ভুলে-যাওয়া আমারি অতীত মুখচ্ছবি।
সে ছবি থাকেনা স্থির, অচিরে মিলায়,
একালের নানা ছবি ভেসে ওঠে মনের পর্দায়।

প্রবাসের সেই দেশ, যে দেশে লোকের
গোলা-ভরা ধান আর গলা-ভরা গান,
কামানে মেশিন গানে শিবা শবে সে দেশ শ্মশান
পশ্চিমের হানাদারী জঙ্গী বর্বরতা
উল্লাসে লেহন করে আকাশ মাটির শ্যামলতা।
আমার ভাইয়ের রক্তে, বোনের রুধিরে
শ্যামাঙ্গী মাটির বুক হয়ে গেল লাল,
লাল হলো নীল-নীরা চিত্রা বেগবতী।

তারপর -- তারপর দেখি —
লক্ষ লক্ষ দধীচির তনুদানে আর
বর্বরের অবদানে উর্বর মাটির নবাঙ্কুর,
অগ্নিগর্ভ শপথের সদ্যোজাত কোলের সন্তান —
অনধীন বাংলাদেশ, স্বাধিকারে সুস্থিত বাঙালী

কবি ও কবিতা, মহালয়া : ১৩৬৭

আয় রে ছুটে আয়

(ছড়ার ছন্দে)

বাংলা জুড়ে বান ডেকেছে   হলো বিষম দায়,
আয় কে তোরা ত্রাণে যাবি   আয়রে ছুটে আয়।
ভব-কারার গরাদ ভেঙে   মুক্তি যারা চায়,
তাদের সাথে বাধ না সেধে   ত্রাণে যাবি আয়।
হাট ডুবেছে, মাঠ ডুবেছে   ডুবলো বাড়ি ঘর,
স্থলের সঙ্গে জলের আড়ি   প্রতিটি বৎসর।
বন্যাতে চৌদিকে যখন   জল করে থৈ থৈ,
আমরা তখন ছড়িয়ে বেড়াই   প্রতিবাদের খৈ।
ডি ভি সিকে ছিছি করি   আকাশকে দিই গাল,
উড়ো জাহাজ চড়ে দেখি   ডুবো লোকের হাল।
পনেরোটি জেলার যখন   দশটি জলের তল,
কাজের ফাঁকি কথায় ঢাকি,—   অটুট মনের বল।
প্রলয়-জলে ডোবে যখন   ছাপ-মারা সব জ্ঞান,
জলের উপর ভাসে শুধু   প্রকল্প আর প্ল্যান।
বানের তোড়ে লোকের যখন   ওষ্ঠাগত প্রাণ,
কড়া ভাষায় বানকে জানাই   মারমুখী আহ্বান।
হাজার হাজার কণ্ঠে যখন   'ত্রাহি ত্রাহি' রব,
শুকনো ডাঙায় বসে তখন   ত্রাণের মহোৎসব।
আপন রীতে বানে যখন   ধরে ভাঁটার টান
বান-ঠেকানোর গৌরবে প্রাণ   আহ্লাদে আটখান্।
ঢাকে-ঢোলে জানান দিয়ে   শপথ মহত্তর
বগল বাজাই মনের সুখে   বাকী বছর ভর।